বাবার গামছা

– মোস্তফা কামাল

আমার মা–বাবার কাছ থেকে শুনেছি।

একবার আমার মা–বাবা আমিসহ আরো অনেকে আমার মায়ের নানির বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। বড় নৌকায় করে। আমি তখন দেড় বছরের ছোট ছেলে।

মহা আনন্দে সবাই বেড়াতে যাচ্ছে। হঠাৎ ঝড় শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সবার আনন্দ মাটি। মহিলারা সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। পুরুষরা সবার কাছ থেকে খুচরা পয়সা তুলছে নদীতে ফেলবে বলে।

আমার মহৎ বাবা ভাবছেন কিভাবে তার পুত্রকে বাচানো যায়! তাই মাঝির কাছ থেকে একটি গামছা নিয়ে আমাকে তার পেটের সঙ্গে বাধলেন।

সবাই জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, মরলে আমরা বাপ–ছেলে এক সঙ্গে মরবো আর বাচলে এক সঙ্গে বাচবো।

এক সময় নদীর উত্তাল ঢেউ শান্ত হয়। আমরা সবাই বেচে যাই।

সাভার, ঢাকা থেকে

পদ্মা পাড়ে

– ওয়াহেদুজ্জামান

মুক্তিযুদ্ধ শেষ হবো হবো সময়ে মিত্র বাহিনী বোমা মেরে হার্ডিঞ্জ বৃজের একটা খিলান বা স্প্যান (Span) উড়িয়ে দিল। পাকবাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত জেনে সারা দেশ থেকে উঠিয়ে ঢাকায় জড়ো হওয়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ বৃজটা ভাঙার আদৌ কোনো প্রয়োজন ছিল কি না তা এক মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন বটে!

পাকশিতে পদ্মা নদীর ওপর বৃটিশ সাম্রাজ্যের অহমিকা বুকে নিয়ে মাথা উচিয়ে দাড়িয়ে আছে হার্ডিঞ্জ বৃজ। ছোটবেলা থেকে এই বৃজ দিয়ে পদ্মা পার হয়ে আসছি। ফারাক্কার আগ্রাসী থাবায় নজরুলের রুপালী পদ্মা, আবদুল আলিমের *সর্বনাশা পদ্মা* আজ শুধুই স্মৃতি। এখন তিরতির করে বয়ে চলা নদী দেখে মনে হয় এক চিমটে খাল।

বঙ্গবন্ধু যদি ইনডিয়াকে ফারাক্কা খোলার অনুমতি না দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে সমস্যার মোকাবেলা করতেন তাহলে আজকের দৃশ্যপট ভিন্ন হতো। বয়সের ভারে ন্যুব্জ ভাসানী কয়দিন চেচামেচি করে পাড়ি দিলেন পরপারে। বাকি নেতারা সব মুখে কুলুপ এটে বসে রইলেন। দেখতে দেখতে ফারাক্কা নামের দৈত্য গ্রাস করলো গোটা অঞ্চলটাকে।

উনিশ কিংবা বিশটা পিলার মাথায় করে রেখেছে হার্ডিঞ্জ বৃজকে। গত বছর দেখলাম তার মাত্র তিনটা পিলার পানির মধ্যে, বাকিগুলো সব ধু ধু বালির ওপর দাড়িয়ে খাবি খাচ্ছে। গ্যারান্টি ক্লজ ছাড়া গঙ্গা পানি চুক্তি করে পানি প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ অধিকার হাসিনা সরকার ইনডিয়ার হাতে তুলে দিয়েছে। দেশের স্বার্থ বিরোধী এই চুক্তিকে তখন দলবাজ পত্রিকাগুলো এমনভাবে প্রচার করেছিল যেন পানিকন্যা সারা সাগর মহাসাগরের পানি আজলা ভরে তুলে এনে পদ্মায় ঢেলে দিয়েছে। হার্ডিঞ্জ বৃজের একটা পিলারের কপালের ওপর বড় করে লেখা আছে যা আজও দৃষ্টিকটুভাবে চোখে পড়ে। *শেখ হাসিনার অবদান পানি সমস্যার সমাধান*। খোদ এই পিলারটাও চরের মাঝখানে দাড়িয়ে এক ফোটা পানির জন্য কাতরাচ্ছে। এর চেয়ে বড় তামাসা আর কি হতে পারে!

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের লণ্ডভণ্ড অর্থনীতি নিয়েই বঙ্গবন্ধু ভাঙা স্প্যানটা মেরামতের কাজে হাত দিয়েছিলেন। তার এই সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ স্বপ্নে পাওয়া বৃজকে নিয়ে টানা হেচড়া না করে ওই স্প্যানটার নাম দেয়া যেতে পারে *বঙ্গবন্ধু স্প্যান*। হার্ডিঞ্জ বৃজ পুনরায় চালু না হওয়া পর্যন্ত পদ্মার দুই পাড়ে ট্রেন এসে থামতো। রেলওয়ের স্টিমার যাত্রী পারাপার করতো। স্টিমার ছাড়তো ট্রেনের সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। আর ট্রেনের সময়! সে তো *নয়টার ট্রেন কয়টায় যায়?*

বেলা গড়িয়ে আসছে। পদ্মা পার হয়ে কিছুটা রাস্তা বাসে, কিছুটা ঘোড়ার গাড়ি *টমটম*। তারপর মাইল তিনেক মেঠো পথ ধরে হাটলেই বাড়ি। লাস্ট বাস মিস করলে ভেড়ামারা স্টেশনের উন্মুক্ত প্ল্যাটফরমের পেট ছেড়া কংকৃটের বেঞ্চে বসে সারা রাতের জন্য মশার খোরাক যোগাতে হবে।

স্টিমার ছাড়ার আর অপেক্ষা না করে আমরা তিন চার বন্ধু মিলে নৌকায় চেপে বসলাম। আমাদের দেখে তিনটা মেয়েও আমাদের নৌকায় উঠলো। মেয়ে তিনটাকে আমরা ফলো করতে করতে আসছিল সেই রাজশাহী থেকে। কি দেমাগি মেয়ে বাবা! এক সঙ্গে পথ চলা, তবুও একটু পাত্তা দিচ্ছে না। তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার মহড়া দেখে নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করে আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করতে করতে আসছে। তাদের এক নৌকায় পেয়ে আমরা মহাখুশি।

তখন ইঞ্জিনের নৌকার প্রচলন ছিল না। নানান রঙের পাল তোলা ছোট-বড় নৌকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমাদের ছোট ডিঙি নৌকা তর তর ছুটে চলেছে। ঘণ্টা খানেক চলার পর আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। মেয়েদের মুখের হাসি সরে গিয়ে আধার নেমে এলো। এ মা, ঝড় উঠবে নাকি! আর তখনই ঝড় উঠলো। মেয়েরা কান্না জুড়ে দিল।

দক্ষ মাঝির আশ্বাস, মায়েরা কাইনদেন না, আল্লাহর ডাকেন।

শান্ত পদ্মা ভিন্ন মূর্তি ধারণ করেছে। পাহাড় সমান একেকটা ঢেউ এসে আমাদের নৌকাটাকে আছড়ে ভাঙতে চাইছে। আমরা শার্ট খুলে, প্যান্ট হাটু পর্যন্ত গুটিয়ে থালা-ঘটি-বাটি যা পেলাম নৌকায় তা দিয়ে সমানে নৌকার পানি ছেচে বাইরে ফেলছি। নৌকা উল্টে গেলে সাতার দেবো।

যে মেয়েটা ট্রেনের মধ্যে আমাকে মুখ ভেংচি কেটে দেখিয়েছিল তার নাম না থাক। এতোদিন পরে নাম-ধাম লিখে বিব্রত করা ঠিক না। তার নাম দিলাম জলি।

জলি কাদতে কাদতে আমার হাত চেপে ধরে বললো, ভাই, আমি সাতার জানি না। আমাকে ফেলে যাবেন না। *এখন দেখি জীবনটা তোর ষোল আনাই মিছে* কবিতার লাইনটা মনে পড়লো।

যৌবনের সেই উত্তাল দিনগুলোতে এমন সুন্দরীকে নিয়ে পদ্মা কেন, সাত সমুদ্র চোদ্দ নদীও পাড়ি দিতে পারি। তাকে অভয় দিলাম, ভয় নেই। তাকে পিঠে নিয়ে সাতার দেবো। জলির বুকের ওড়না দিয়ে দুজনের কোমর পেচিয়ে তাকে পিঠের সঙ্গে বেধে ফেললাম। কি বোকামি সিদ্ধান্তই না ছিল সেটা! নৌকা ডুবে গেলে দুজনের কেউ কি বাচতে পারতাম সেদিন!

বাকি মেয়ে দুটিও দুই বন্ধুকে ধরে পাল্লা দিয়ে কেদে চলেছে।

তাদের কান্নায় গঙ্গামায়ের মন গলে গেল। উথাল-পাথাল করতে করতে ঘাট থেকে মাইল খানেক ভাটিতে গিয়ে নৌকা কুলে ভিড়লো। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে তখন।

বৃষ্টি মাথায় জলকাদা ভাঙতে ভাঙতে যখন ঘাটে পৌছলাম তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। ভেজা শরীরে, বাতাসের তীব্রতায় ঠক ঠক করে কাপছি আমরা।

জলি একবার পা পিছলে আছাড় খেয়ে উঠে এক হাত দিয়ে আমার কোমর পেচিয়ে ধরে পাশাপাশি হাটছে।

ঘাটে এসে দেখি দোচালার কয়েকটা চা-এর দোকানে গাদাগাদি করে লোক দাড়িয়ে বৃষ্টিকে অভিশাপ দিচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে আমরা চাপাচাপি করে দাড়ালাম। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশের বুক চিরে এক চিলতে

বিদ্যুৎ ছুটে এসে কয়েক সেকেন্ডের জন্য আলোকিত করে আবার পালিয়ে যাচ্ছে। জলি এমন ভয় পেয়েছে, আমাকে আর ছাড়তে চাইছে না। ভিড়ের মধ্যে পেছন থেকে দুই হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে থাকলো।

তার উচু বুক আমার পিঠের সঙ্গে চিড়ে চ্যাপটা হচ্ছে। কে জানতো মেয়েরা বুকের মধ্যে এতো উষ্ণতা লুকিয়ে রাখে! ও দুটির ওম পেয়ে গা থেকে আমার শীত পালিয়ে গেল। শরীরে তখন এক ধরনের শির শিরে ভালো লাগা, আহ, আজ সারা রাত যদি বৃষ্টি না থামতো, দাড়িয়ে দাড়িয়ে কাটিয়ে দিতে পারতাম সারা রাত!

সেই রাতের কাহিনী আরেকটু দীর্ঘ হয়ে জলির বাবার মীর শওকত স্টাইলের গোফ আর হাতের পুলিশি ডান্ডার ভয়ে মাঝ পথে শেষ হয়ে গেল।

তার বাবা ছিলেন পুলিশ লাইনের কমান্ডেন্ট। প্রায় ভাঙা ঢোলের মতো মোটা গলায় প্যারেড করাতেন লেফট-রাইট-লেফট। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাদের সরকারি কোয়ার্টারের পেছনে লাউমাচার তলায় দাড়িয়ে দাড়িয়ে জলির বুকে মুখ লাগিয়ে সঞ্জিবনী সুধা পান করছি। আকস্মিক ভাঙা ঢোলের বাড়ি, কে ওখানে!

জলি থর থর করে কাপতে লাগলো।

আমি ড্রাগস ছাড়াই কার্ল লুইসের স্পিডে দিলাম দৌড়। পেছন থেকে শুধু শুনতে পেলাম, এই ধর হারামজাদাকে।

জীবনে আর কোনোদিন পুলিশ লাইনের আশপাশ দিয়েও হাটিনি। জলি কয়েকটা চিঠি দিয়ে নিরাশ হয়ে ডেডলাইন দিয়ে শেষ চিঠি দিয়েছিল, অমুক তারিখের মধ্যে দেখা না করলে *সুইসাইড* করবো। জলির ডেডলাইন জলিলের মতোই সুপারফ্লপ করেছিল। পুলিশ কর্মকর্তার ঘরে সে সুখে আছে। সুখে থাকুক চিরদিন।

সউদি আরব থেকে

তালতো বোন

– অজয়

হেজাফরের দোকানে বসে নিয়মিত গোল্ডলিফে টান দেয়া আর নয় রাজ্যের যতো সব অশ্লীল কথাবার্তার মহড়া চলে প্রতিনিয়ত। এর পরিচালনায় ছিল আনপ্যারালাল কয়েকজন বেকার। গ্র্যাজুয়েট হেফাজ, লোহা হাসান, বিস্কুট বেলাল, হ্যান্ডসাম রিদুয়ান, শ্যারন শাজাহান ও কনডম হুমায়ুন তাদের অন্যতম। কতিপয় দুষ্টু বালক তার শার্টের পকেট হতে একদা কনডম আবিষ্কার করায় হুমায়ুন এই দুর্লভ নামে ভূষিত। যদিও এর কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি।

আজকের গল্পটি হুমায়ুনের সদ্য আত্মীয়া রসের তালতো বোন (বিয়াইন) কে নিয়ে। একদা মেয়েটি তাদের বাসায় বেড়াতে আসায় হুমায়নের বাসায় উঠতি বয়সের ছেলেদের আনাগোনা উদ্বিগ্নজনক হারে বৃদ্ধি পায়। যেন ঐশ্বরিয়ার আগমন। মেয়েটির অপরাধ, সবার সঙ্গে হেসে কথা বলা আর চলনে বিচিত্র ঢং। এর পরিপ্রেক্ষিতে সুশীল বন্ধু সমাজ বুকিং দেয়ার যুদ্ধ ঘোষণা করে দিল। সবার একই কথা বিনা যুদ্ধে নাহি দেবো তালতো বোনের চুল। মোট কথা, সবার অবস্থা ভাদ্র মাসের কুকুরের মতো।

বন্ধু শাহাজান তো হুমায়ুনকে বলেই ফেললো যে, বেরা, তোর তালতো বোনে আস্ত পুয়া খোর (ছেলে খেকো)।

আমি বারবারই চুপ ছিলাম। তারপরেও মেয়েটির জন্য আমার হৃদয়ে রক্ত ক্ষরণ শুরু হলো। তাই সম্পূর্ণ নিজের উদ্দেশে গ্রামের পাশে বয়ে যাওয়া মেধার খালে নৌকা ভ্রমণের উদ্যোগ নিলাম।

সবাই এক বাক্যে রাজি। প্ল্যান মোতাবেক নির্দিষ্ট স্থানে একে একে সবাই হাজির হলেও একটু পরেই হুমায়ুনের সঙ্গে বহু প্রতীক্ষিত সুসজ্জিত দেবীর আগমন। তখনই বুঝতে পারলাম বন্ধুদের নৈতিক চরিত্র অধঃপতনের কারণ। ফিগার আনুমানিক বিয়াল্লিশ, আটাশ, ছত্রিশ ইঞ্চি।

সবাই নৌকায় উঠলো। কিন্তু দেবীর পাশে হুমায়ুনের অবস্থান আমাকে ব্যথিত করলো। নৌকা মেধা খালের ওপর দিয়ে মহেশখালীর চ্যানেল ঘেষে চলতে শুরু করলো। তখন আমার চব্বিশ বছরের কবিত্বকে ঢেলে দিয়ে তালতো বোনের মন জয়ের যুদ্ধে নেমে পড়লাম।

অসভ্য বাতাস যেন মেয়েটির বস্ত্র হরণ শুরু করে দিল। বুকের ওড়না সামলাতে না পারায় তখন সবার শকুনি চোখ জায়গা বরাবর। বাংলার চিরায়ত সৌন্দর্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নেই কারোর। সবাই তালতো বোনের সৌন্দর্যের কীর্তন শুরু করলো। আস্তে আস্তে তাকে সবাই যেন খোলা ময়দান ভাবতে শুরু করে দিল।

আমি হই চই-এর মধ্যে না থেকে তার সৌন্দর্যকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করলাম। ভালোবাসতেও শুরু করে দিলাম। আমার কেন যেন মনে হলো, মেয়েটি আমাকে অন্যদের মতো সহজভাবে মেনে নিতে পারছে না, হয়তো অন্যদের মতো না হওয়াতে, হয়তো আমার মনের ভুল। সবার মতো আমিও ছোলা চিবুছিলাম। এর মধ্যে এক সর্বনাশ ছোলা এসে মেয়েটির ঠিক বুকের মাঝখানে পড়লো যা সেখানে থেমে না থেকে দুই পাহাড়ের গিরিপথে বেয়ে সোজা ভেতরে। আমি তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করাতে মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হলো যা আমার সর্বনাশ ডেকে আনলো।

আমি তখন এপাশ-ওপাশ ফিরে অপরাধীকে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। আর তখনই মেয়েটির সন্দেহের দানা পাকাপোক্ত হলো। এক অজানা লজ্জা আমাকে চেপে বসলো। মাথা হেট হয়ে রইলাম এবং ওই বেটাকে গালি দিতে লাগলাম মনে মনে। এটা নিশ্চয়ই লোহা হাসানের কাজ।

নৌকা মহেশখালী চ্যানেল পাড়ি দিয়ে পুনরায় মেধা খালে দিয়ে পূর্ব ঘাটে এসে থামলো। সবাই নেমে পড়লেও আমি করুণভাবে মেয়েটির দিকে চেয়ে রইলাম অপত্যাশিত ঘটনার জন্য। খুব মায়া হলো মেয়েটার জন্য। হয়তো ছোলাটা এখনো ব্রা-র কোনো এক ফাকে আটকে আছে উত্তপ্ত অবস্থায়। আমার ঘোর কাটলো মেয়েটির ডাকে।

দাদা, একটু শুনুন, আপনার সঙ্গে দুটা কথা আছে।

সবাই তো হা করে আছে আমার দিকে আর আমি? রক্তের প্রতিটি কণা বলে উঠলো, *আমি পাইলাম, আমি ইহাকেই পাইলাম।* সার্থক মোর নৌ ভ্রমণ। ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়ার পর ব্রজেন দাসের সেই বিখ্যাত হাসিটার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে, বীরদর্পে এগিয়ে গেলাম রসের তালতো বোনের ভালোবাসার মধু কথাটি শোনার জন্য।

কিন্তু মেয়েটি আমাকে যা শোনালো বাপের জন্মেও কেউ বলেনি আমাকে।

সে অনর্গলভাবে বলতে লাগলো, আমি একজোড়া নতুন জুতা কিনেছি হিলসহ। ভাবছি তলায় লোহার নল বসিয়ে নেবো। তারপর তোর দুই গালে নলের ছাপ চিরদিনের জন্য বসিয়ে দেবো।

কথাটা শোনার পর আমার কি হয়েছিল জানি না। তবে যখন চেতনা ফিরে পেলাম তখন দেখি আমার আশপাশে কেউ নেই।

সূর্যমামা তখন পাঠশালায়। আমি কিছুতেই হিসাব মেলাতে পারছিলাম না। আমার অপরাধ বুঝতে পারলাম, মেয়েটিকে খোলা ময়দান না ভাবা, শক্ত কোনো কটূক্তি কিংবা খারাপ চোখে না দেখা। এটাই আমার অপরাধ। রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে শেষ পর্যন্ত মানিব্যাগে রাখা শেষ সম্বল গাজাটুকু স্টিক বানিয়ে টানা শুরু করলাম। ভগ্ন হৃদয়ে ও রক্তচোখ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

এরপর থেকে নৌকা ভ্রমণ বা নৌকা দেখলেই মনে হয় নদীতে তালতো বোনের হিল তোলা জুতা ভেসে যাচ্ছে আর আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ঠিকানা বিহীন

জোকা

– অপূর্ব আকন্দ

১৯৮৮ সাল। আমরা নানাবাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছি। আমার বয়স তখন পাচ ছয় বছর। বন্যায় চারদিকে থই থই করছে। উল্লেখ্য, আমাদের বাড়ি নওগা জেলায় রানীনগরে এবং নানাবাড়ি বগুড়ার আদমদিঘীতে। যাতায়াত পথ বর্ষাকাল এবং বন্যা বিধায় নিশ্চিত করে নৌকা।

প্রথমে আমরা মাদারতোলা ঘাটে গিয়ে নৌকায় উঠলাম। শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নৌকা চলছে। নাগর নদীর কিছু কিছু জায়গা সম্পর্কে কুসংস্কার আছে। তেমনি একটি জায়গা জোকা। আর নাম *জোকা* হলো কি কারণে তা আমার জানা নেই। তবে জোকা না হয়ে যদি *ধোকা* হতো তাহলে নামটা মনে হয় সার্থক হতো।

জোকা ছিল হিন্দুদের শ্মশান ঘাট। এখানে হিন্দুদের পোড়ানো হতো। এখানে নদীর এমন বাক ছিল যে, প্রায় এক মাইল ঘুরে এলে দেখা যেতো দুই জায়গা খুবই পাশাপাশি। অর্থাৎ এর মাঝখানে আধা বিঘা পরিমাণ জায়গা যদি না থাকতো বা মিলিয়ে দেয়া যেতো তাহলে ওই এক মাইল জায়গা পাড়ি দিতে হতো না।

ওই জোকার জায়গাটিতে যখন শ্যালো ইঞ্জিনচালিত নৌকা পৌছালো তখন বিপরীত দিক থেকে আসছিল একটা স্টিমার। চালক কোনো কিছু ঠিক করার আগেই প্রচণ্ড ধাক্কা। নৌকাতে পানি ওঠা শুরু করলো এবং দেখতে দেখতে ডুবে গেল। ওই নৌকায় অনেক শিশু ছিল। সে এক করুণ দৃশ্য।

আমার বয়স তখন ছয় সাত। একটু একটু সাতরাতে পারি। জানি না কিভাবে বেচে উঠলাম। সবচেয়ে অবাক করা বিষয়, ওই দুর্ঘটনায় তিনজন বৃদ্ধ মারা গেলেও কোনো শিশু সন্তান মারা যায়নি।

নারায়ণগঞ্জ থেকে

ম্যারেজ ডে

– মিজান

১৯৯৮ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। ঢাকার পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ বাসাবো, গোড়ান, মাদারটেক এলাকা বন্যার পানিতে ভাসছে। এমনি মুহূর্তে আমাদের ম্যারেজডে। প্রতি ম্যারেজ ডে-তে আমরা দুজনে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যাই। এবার দুজনে সিদ্ধান্ত নিলাম কোথাও যাবো না, নৌকা চড়ে ঘুরে বেড়াবো সন্ধ্যা পর্যন্ত।

সেই কথা মতো দুজনে সেজেগুজে বের হলাম। আমার বাসা ছিল একেবারে বাসাবো ঝিলপাড়ে। আমার বাসার পাশ দিয়েই মাদারটেকের নৌকাগুলো বিশ্বরোডে যাওয়া-আসা করতো।

আমরা দুজনে নৌকা ধরার জন্য চতুর্থ তলা থেকে দ্বিতীয় তলায় সিড়িতে দাড়িয়ে আছি। নিচ তলা তখন পানির নিচে। কিছুক্ষণ পরই একটা খালি নৌকাকে ডাক দিতেই সে এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। কিন্তু কোনোক্রমেই সিড়ির কাছে আসতে পারছিল না বিধায় অনেক কষ্টে বাউন্ডারি ওয়ালে পা দিয়ে নৌকায় লাফ দিতেই নৌকা কিছুটা দুলে উঠে সরে যায় আর আমি ব্যালান্সহীন হয়ে পড়ি। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমার স্ত্রী নৌকায় লাফ দিয়ে উঠতেই নৌকা আরো কিছুটা সরে গেলে আমি ঝুপ করে পানিতে পড়ে ডুবে যাই।

পানিতে পড়ে গেলে আমার স্ত্রীও ব্যালান্সহীন হয়ে সেও ঝুপ করে পানিতে পড়ে যায়।

আমাদের এই অবস্থা দেখে পাশের নৌকাগুলো থেকে লোকজন এসে আমাকে উদ্ধার করে। এমতাবস্থায় কাকভেজা হয়ে বাসায় ফিরলে সবাই অবাক হয়ে যায় এবং ছেলেমেয়েলা ঘটনা শুনলে হাসির রোল পড়ে যায়।

প্রতি বছরই এভাবে ২২ সেপ্টেম্বর এলে সেই দিনের কথা নিয়ে আজও আমরা সবাই হাসি ঠাট্টা করি।

সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা থেকে

পিঠা

– শফিকুল ইসলাম

জীবন ও জীবিকার তাগিদে প্রতি সপ্তাহেই ঢাকা যেতে হয়। বর্ষায় লঞ্চ যাত্রা যদিও বিপজ্জনক তবুও আমার কাছে খুব আনন্দের মনে হয়। খুব বড় ব্যবসা করতাম না বিধায় প্রায়ই লঞ্চের ডেকের ওপর শুয়ে ঢাকা যেতাম। এভাবে যাওয়াটা গরু–ছাগল, হাস–মুরগির প্রতিরূপ। লঞ্চে ওঠার আগে একটা খুশির আমেজ বয়ে যেতো আমার দেহে। রুটি, কলা, পানি, তাশ, সিগারেট নিয়ে লঞ্চে উঠে একটা সুন্দর জায়গা দেখে চাদর বিছিয়ে আয়েশ করে বসতাম।

একদিন এক মাঝ বয়সী মহিলা দুটি পাতিল হাতে আমার চাদরের কাছে এসে বলেন, একটু জায়গা হবে।

বললাম, হবে না মানে, বসেন বসেন, কোনো সমস্যা নেই। সঙ্গে আর কেউ নেই?

মহিলা বললেন, না পাতিল দুটো আমার পাশে রাখে বললেন, মেয়ের জন্য পিঠা।

পিঠার কথা শুনে লোভ সামলিয়ে রাখতে পারি না। মহিলাকে পটানোর চেষ্টা করি। লঞ্চ তখন কীর্তিনাশা, আড়িয়াল খা পেরিয়ে মেঘনার বুকে। আমি তাকে খালা বলি।

তিনি পুত্রের স্নেহে আমাকে দেখেন। মিথ্যা কথা বলি। আমার একটি খালা আছে। আপনার মতোই আমাকে আদর করেন। একটি ছলনার নিঃশ্বাস ফেলি তার দিকে আর বলি, কালই বিদেশ চলে যামু, বিকাল পাচটায় আমার ফ্লাইট। সউদি যামু। কবে আসি আল্লাহই জানে, ঘরে সৎ মা। খুব কষ্ট ইত্যাদি।

মহিলা আমার ছলনায় মজে গেলেন। আমার মাথায় হাত রেখে বলেন, সব ঠিক হইয়া যাইবো, দুঃখ করো না। এই বলে তার পাতিল থেকে পিঠা বের করে দেন।

একটি খেয়েই বলি, মা মারা যাবার পর এমন পিঠা কখনো খাইনি।

তিনি আমাকে আরো পিঠা বের করে দেন।

আমি খেয়ে খেয়ে মনোবাসনা পূরণ করি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত অনেকটা হেলে পড়েছে। লঞ্চের মানুষগুলো এলিয়ে দিয়েছে তাদের শরীর ডেকের ওপর ভোরের অপেক্ষায়। আমি শুধু জেগে থাকি মনোবাসনা অন্য ভাবে পরিতৃপ্তি করতে।

এক সময় দেখি আমার পাশেই যে ঘুমে আচ্ছন্ন, আমি ঘুমের ভান করে তার পাশে শুয়ে পড়ি। আমার লালসা মেটাতে এবার হাত দিই তার স্তন যুগলে।

তিনি একটু নড়েচড়ে ওঠেন।

আমি বার বার তার স্তন স্পর্শ করার চেষ্টা করি।

তিনি এদিক–ওদিক ঘুরে শোন।

আমি আরো গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করি। নাভি, নিতম্ব আরো নিচে।

এক পর্যায় মহিলা আমার হাত ধরে উঠে বসেন। আমি ঘুমের ভান করতেই সে ধমকের সুরে বলেন, চিৎকার দিমু।

আমি উঠে বসতে বাধ্য হলাম।

তিনি বললেন, এই আমার পিঠার প্রতিদান?

চিৎকার করে লোক জড়ো করে তোমাকে মারতে পারতাম। শুধু নিজের ছেলের মতো ভেবে রক্ষা করলাম।

তখন বাইরের আষাঢ়ের প্রচণ্ড বৃষ্টি, আমি শুধু বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

গয়ঘর, পালং, শরিয়তপুর থেকে

সমুদ্রের মাঝি

– মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম

মাঝিদের ভ্রমণ নিয়ে বলতে নেই। কারণ ভ্রমণই এদের পেশা। আমাদেরও তাই। কারণ আমরাও মাঝি গোত্রের। পরিবারের কাছে ভবিষ্যৎ ক্যাপটেন কিংবা তিমুর কাছে পুরোপুরি *মাঝিভাই*। আমরা মেরিনাররা একেকজন সত্যিকারের মাঝি। সেই মেরিন একাডেমি থেকে শুরু করে এ দেশ ও দেশ সমুদ্র ভ্রমণ। লক্ষ্য একটাই, আমাকে আরো বড় মাপের মাঝি হতে হবে। নৌপথ কিংবা সমুদ্রপথের ওপর পুরোপুরি দখল চা–ই চাই। সেই সঙ্গে প্রচুর ইউ.এস ডলার। তাই যাযাদির *নৌপথ* ভ্রমণে আমরা পেশাজীবী ভ্রমণকারী। আমাদের কাছে Ship is my home, sea is my playground, water is my way, port is my passion, travelling is my job.

হ্যা তাই। ভ্রমণই আমাদের চাকরি। এই ভ্রমণে আমরা কখনো কলাম্বাস, কখনো টাইটানিক কিংবা কখনো বিশাল সমুদ্রের একটানা একাকী বন্ধু। কারণ চলছি তো চলছিই। একটানা দশ পনেরো দিন কোনো দ্বীপ তো দূরে থাক, অন্য কোনো জাহাজও চোখে পড়ে না। বিরক্ত হওয়ার সুযোগ নেই। মেরিনারদের ভ্রমণে বিরক্তি নেই। কেননা সমুদ্রের মাঝখানেই চলছে নাচ, গান, পার্টি, খেলাধুলা কিংবা জিম। অথবা পোর্টে এলেই শপিং, ক্লাব, ডিসকো অথবা বারে। এখানে সুন্দরী মেয়েদের একটু বাড়াবাড়ি আদর–আহ্লাদ যেন নতুন করে জীবনীশক্তি ফিরিয়ে দেয় অনেকের।

চুল কাটার নাম করে Shore–এ যাওয়ার অনুমতি পেলে সিম্যানরা যে একটু বডি মাসাজও করে তা কারো অজানা নয়। জাহাজের ডেক লেভেলে যতোটা না স্বাদ, ফিলিপিনো মেয়েদের হাতে এ স্বাদ বহু গুণে বেড়ে যায় বলে আমার থার্ড অফিসারের ধারণা। এ স্বাদ বড় ভয়ংকর। পাচ ওয়াক্ত নামাজিকেও মাঝে মধ্যে ভ্রমণের এই ভয়ংকর স্বাদ নিতে দেখা যায়। এ স্বাদের বিষ যারা পছন্দ করেন না তারা ব্যস্ত থাকেন ফোন কিংবা কেনাকাটায়। অথবা আমার মতো পাগল হলে বাসে চড়ে পুরো শহর ঘুরে দেখা। এক এক দেশে এক এক ভাষা, রীতি–নীতি, এ এক বিশাল অদ্ভুত ভ্রমণে অনেক রকম মিলনের স্বাদ। পানিপথ ভ্রমণের পুরো কষ্ট মিলে যাবে দেশ ভ্রমণের আনন্দে। পানিপথের পথিক যারা তাদের কষ্টটা অবশ্য অন্য কোথাও। এবং এ কষ্ট বড় নির্মম।

জাপান থেকে অস্ট্রেলিয়ার ইস্ট কোস্ট। বারো তেরো দিনের যাত্রা। চার দিন পরেই খবরটা এলো। জাহাজের এক ক্রুর বাবা মারা গেলেন। মুনির সে কি কান্না! জাহাজ থেকে দেশে যাবে তারও উপায় নেই। কারণ অস্ট্রেলিয়া পৌছতে আরো আট নয় দিন বাকি। ততোদিনে শেষবারের মতো বাবার চেহারা আর দেখা হলো না। এ নির্মমতা যে কারো জীবনে আসতে পারে আমাদের।

জাহাজে ছোট–বড় অনেক দুর্ঘটনাও জীবনের সব আনন্দ শেষ করে দেয় মাঝে মধ্যে। কিংবা ভয়ানক আবহাওয়ায় জাহাজ ডুবে কেউ কেউ হয়ে যান অতল সাগরের যাত্রী। যে কোনো ট্যাংকার জাহাজে বিস্ফোরণে মিশে যেতে পারে জাহাজ কিংবা জাহাজি। এসব নিয়েই আমাদের দিন–রাতের ভ্রমণ।

সাগরের মাঝখানে হঠাৎ পাইরেটসদের আক্রমণে ল্যাপটপ, নগদ টাকা কিংবা মূল্যবান সব হারানোর অভিজ্ঞতা অনেক ভ্রমণকারীরই আছে। এতো কিছুর পরও আমাদের ভ্রমণ থেমে নেই। কারণ Mariners dare to go there, where death fears to go.

যাই হোক। ল্যান্ডের অন্য যে কোনো পেশার মানুষের চেয়ে সমুদ্রযাত্রীরা কম সুখী নয় বলে আমার ধারণা। পৃথিবীর কতোজনের ভাগ্যে চব্বিশ বছর বয়সে উনিশটা দেশ ঘোরার সুযোগ হয়েছে আমার জানা নেই। জায়ান্ট তিমি আর শ শ ডলফিন কিংবা হাঙ্গরের দেখা আমাদের হয়। প্রকৃতির অদ্ভুত সৌন্দর্য ওয়াটার স্পাউট, কোরাল রিফ কিংবা সমুদ্রের মাঝখানে বেড়ে ওঠা ভলকেনোস। কোথাও অদ্ভুত নীল, কোথাও লাল আবার কোথাও কালো, সবুজ সমুদ্র আমাদের মনে করিয়ে দেয় সৃষ্টিকর্তার বিশালতার কথা।

এতো কিছুর পরও পেশাগত ভ্রমণ আবুলমাঝির নৌকায় তিমুকে সঙ্গে নিয়ে কর্ণফুলি পাড়ি দেয়ার মতো মজার নয় মোটেও। বারবিকিউ কিংবা ইনডোর পার্টি আমার স্টেডিয়াম আড্ডার চেয়ে বেশি রসাত্মক মনে হয় না। ফিলিপিন্স, চায়না, ব্রাজিল, অস্ট্রেলিয়া কিংবা ইওরোপের কতোশ সুন্দরী দেখা হলো। কিন্তু কোথাও আমার কোকড়া চুলের চিকন কণ্ঠি তিমুর দেখা মিললো না। শুধু একটাই পাওয়া, সমুদ্রের মাঝখানে দাড়িয়ে জাহাজের বৃজ থেকে চিৎকার করে বলতে পারা, তিমু, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

ভালোবাসার উত্তরে তিমুও হয়তো বলছে, একটা চুমু খাবে মাঝিভাই।

সিংগাপুর থেকে

towhid35th@yahoo.com

আপত্তি

– ছদ্ম

জালের মতো ছড়িয়ে থাকা ছোট-বড় অসংখ্য নদ-নদী ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে এখন মানুষ খুজে পাওয়াটাই ভার যার জীবনে অন্তত একবার হলেও নৌপথ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা মেলেনি।

আসামের লুসাই পর্বত থেকে উৎপত্তি হওয়া বাংলাদেশের সুবিখ্যাত ও অন্যতম বৃহৎ নদী মেঘনা পাড়ে রায়পুরা থানার পূর্ব অঞ্চল বলে কথিত *আলগী* নামের গ্রামে আমার জন্ম এবং বর্তমান নিবাস। এই গ্রামকে নিয়ে গর্ববোধ করি এ জন্য যে, এখানেই জন্ম নিয়েছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রখ্যাত চিত্র শিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ।

যেহেতু মেঘনার তীরে বাস সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই নৌপথের কিছু অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতির ঝুড়িতে রক্ষিত থাকবেই।

ছোটকালে শীতের সকালে বাড়ির পূর্ব দিকে সূর্যমুখী হয়ে বসে রোদ পোহাতাম, খেলতাম এবং বাড়ির পাশ দিয়ে প্রবাহিত মেঘনার বুক চিরে অসংখ্য ছোট-বড় নৌকার বহর এক সঙ্গে বয়ে চলার মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতাম। প্রায় প্রতিদিনই দেখতাম গুনে টানা নৌকার মাঝিরা একে অন্যটিকে পেছনে ফেলার প্রতিযোগিতাতে নেমে গুনে গুনে প্যাচ লেগে টানাটানি, গালাগাল, মারামারি, কাটাকাটির দৃশ্য।

বর্ষাকালে সর্বনাশা ঝড়ের ছোবলে পড়ে লঞ্চ, নৌকা ডুবে যাওয়া, লাশ দেখে ভয়ে-শোকে কান্নার অভিজ্ঞতাও নেহায়েত কম নয়।

ফাল্গুন-চৈত্র মাসে উত্তরবঙ্গের হাওড় থেকে ধান আহরণের আশাতে দূর-দূরান্ত থেকে আগত বিশাল নৌকার বহর দেখে বিমুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকতাম। দখিনা হাওয়াতে পাল তুলে একজন হাল ধরছে আর বাকি সবাই ছাপরে জড়ো হয়ে ঢোল-ডুগি বাজিয়ে সমস্বরে কোরাসের ভঙ্গিতে মহা আনন্দে গান করার সেই দৃশ্যগুলো আজ কেবলি স্মৃতি।

আঞ্চলিক ভাষাতে যাদেরকে বলি *খরগা, বোচং, চাঙ্গঁ, চোঙ* ইত্যাদি দিয়ে বর্ষাকালে মাছ ধরার কায়দাগুলোও আজ প্রায় বিলুপ্ত।

শ্যালো ইঞ্জিনের নৌকার *ভট ভট* শব্দে বিরক্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা এই যান্ত্রিক যুগে এসে আজ আমার জীবনের প্রথম নৌকাতে চড়ার কাহিনীটা প্রিয় পাঠককুলকে জানানোর প্রয়াসেই আমার এ লেখা।

শৈশবে জিয়াউর রহমান শাসন আমলে আমার প্রয়াত আব্বা হয়তো শখের বশেই কিছু ইরি ধানের চাষ করেছিলেন। বৈশাখ মাস হতে পারে। ধান কাটার মরসুম। বাড়ি থেকে প্রায় মাইল খানেক দক্ষিণে নদীর কূল ঘেষেই ছিল নব্য চাষী আমার বাবার ধানি জমি। ভেবে দেখলেন যে, মাথায় বয়ে আনার চেয়ে নৌকাতে বহন করে বাড়িতে ধান আনাটাই সুবিধাজনক।

পড়শি এক হিন্দু জেলের কাছ থেকে কিছু সময়ের জন্য তার ডিঙি নৌকাটি ধার নিলেন। সঙ্গে দুজন শ্রমিক ধান কাটায় ব্যস্ত।

আব্বা নৌকা ভাসাতে উদ্যত হতেই আমি লাফিয়ে নৌকায় উঠে পড়লাম, সেই সঙ্গে চাচাতো ভাই ইদ্রিসও। আব্বার প্রবল আপত্তিতেও জেদ ধরলাম, নৌকায় চড়ে মাঠে যাবোই।

কি আর করা! আব্বা নৌকা ভাসালেন। আমরা দুটি ভাই নৌকার মাঝখানে বিছানো বাশের পাটাতনে একে অন্যের মুখোমুখি বসা।

খপ করেই হঠাৎ মনের অজান্তেই অতি আনন্দে খিলখিলিয়ে হেসে উঠলাম। অকারণ হাসি দেখে আমার চাচাতো ভাইও স্বশব্দে হেসে উঠলো। শত চেষ্টাতেও হাসি থামাতে পারছি না।

আমার আব্বা হলেন ক্ষণিকের মাঝি। অভিজ্ঞতা না থাকাতে তার আনাড়ি হাতেই নদীর তীর ধরে বাশের লগি দিয়ে ঠেলেঠুলে কোনো রকমে গন্তব্যে পৌছানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন।

দুজনের হাসির শব্দ আব্বার কর্ণকুহর ভেদ করলো। তার চোখে মুখেও হাসির আভা ফুটিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হাসছি কেন?

এই কেন-র কোনো উত্তর সেদিন আমার কচি মুখ থেকে ব্যক্ত করতে পারিনি। শুধুই হেসেছিলাম।

জীবনের পাতা থেকে অনেক সময়, দিন, মাস, বছর খসে পড়লেও আমার জীবনের প্রথম দিনের সেই আনন্দদায়ক নৌভ্রমণটা আজো স্মৃতির পাতা থেকে এক বিন্দুও মুছে যায়নি। হয়তো আজীবনের জন্য আমার হৃদয়পটে খোদাই হয়ে আছে সেই অনুপম সুন্দর মুহূর্তটি।

আজ একটি প্রশ্ন বার বার আমার মনে উকি দেয়। তা হলো, আমাদের হাসি দেখে আব্বার মুচকি হাসির রহস্যটা।

নব্য চাষী, আনাড়ি হাতের ক্ষণিকের মাঝি আমার আব্বার সেই মুচকি হাসিটা কি আমাদের মতোই আনন্দের ছিল, নাকি ছিল চরম লজ্জার? প্রশ্নটার সমাধান আজো করতে পারিনি, ভবিষ্যতেও পারবো বলে মনে হয় না।

নরসিংদী থেকে

বিয়ে

– মোহাম্মদ আল আমিন সরকার

সেদিন কি বার ছিল, কোন তারিখ ছিল তা আমার মনে নেই। সালটা হবে সম্ভবত ২০০২ সাল। আমার এক ভাইয়ের বিয়ে ছিল সেদিন। সে জন্য আমরা অনেকেই আমার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে নিয়ে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় করে ভাইয়ার বৌ আনতে গিয়েছিলাম। শুরুটা ভালোই ছিল।

কনের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার পর আমরা যখন টাঙ্গাইল হয়ে নৌকাযোগে ফিরছিলাম তখন শুরু হলো দুর্ঘটনা। আমাদের নৌকার তেল ফুরিয়ে গেল। অনেক কষ্টে জোগাড় করা হলো তেল। আমরা যখন নৌকাযোগে বাংলাদেশের বৃহত্তম সেতু যমুনা সেতু অতিক্রম করছিলাম তখন আবার ঘটলো দুর্ঘটনা। নদীর তীর থেকে আমাদের নৌকার দিকে আলোর ফোকাস করে সংকেত দেয়া হচ্ছে।

সংকেত পেয়ে আমাদের মাঝি তার ইঞ্জিনের পাওয়ার বৃদ্ধি করে দিলেন। কারণ নদী পথে ডাকাতি হয়। ডাকাতরা হয়তো নৌকা থামাতে বলছে। কারণ এটি বিয়ের নৌকা। এখানে হয়তো অনেক সোনা-দানা আছে। আমাদের নৌকা যতোই জোরে চলতে থাকলো, আলোর সংকেত ততোই বার বার আসতে লাগলো চারদিক থেকে। আমরা দিশেহারা হয়ে নৌকায় আল্লাহ আল্লাহ করতে লাগলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে তিন চারটি নৌকা ও স্পিডবোটে করে অনেক পুলিশ এসে ঘিরে ফেললো আমাদের নৌকাটিকে।

পুলিশের একজন বললো, বার বার সংকেত দেয়া সত্ত্বেও তোরা নৌকা থামালি না কেন?

আমরা মনে করেছি যে, পুলিশভাইয়েরা হয়তো আমাদের নৌকাটিকে ডাকাতের নৌকা ভেবে সংকেত দিয়েছেন। কিন্তু আমরা তো ডাকাত নই। তাই তো আমাদের কোনো বিপদ নেই।

পুলিশের নৌকা আমাদের নৌকার সঙ্গে ঠেকানোর ফলে কয়েকজন পুলিশ এসে আমাদের নৌকায় উঠে পড়লো। এবং আমাদের দিকে অস্ত্র ধরে রাখলো। আমরা যারা যুবক ছিলাম তাদের সকলকে পুলিশ ধরলো। আমরা আসলে জানি না ঠিক কি জন্যে আমাদেরকে গ্রেফতার করা হলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি কারণে আমাদের গ্রেফতার করা হলো।

একজন পুলিশ বললো, তোরা সর্বহারা।

কারণ ওই দিন পুলিশের একটি ক্যাম্প সর্বহারা কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছিল। সর্বহারারা চারজন পুলিশকে হত্যা করেছিল। আটটি বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র নিয়েছিল। অস্ত্র ফিরে পেতে এবং হত্যাকারীদের ধরার জন্য সবখানে নিয়োগ করা হয়েছিল শ শ পুলিশ ও বিডিআর।

আমরা পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বলতে থাকি, আমরা সর্বহারা নই।

কিন্তু পুলিশ ঠিক তা বোঝে না। তারা বলে, আমরা পালানোর জন্য নাকি বৌ ও বর সাজিয়ে নৌকায় পালাচ্ছি।

প্রায় আধঘণ্টা জবরদস্তির পর আমাদের বেলকুচি থানার একজন পুলিশভাইকে দেখলাম। তিনি আমাকে চিনলেন এবং আমাদের ছেড়ে দেয়ার জন্য অন্য সকলকে বললেন যে, তারা সর্বহারা নয়। এদের বাড়ি সুকুন্দর্গাতীতে। অবশেষে ওই পুলিশভাইয়ের জন্য আমরা সেদিন বেচে গেলাম। তাই আমরা তার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

রান্ধুনীবাড়ির ক্যাম্প লুটের এই ঘটনা আমার মনে রেখাপাত সৃষ্টি করেছে। আমাদের পুলিশভাইয়েরা হয়তো ওই সব আসামিদেরকে এখন খুজে বেড়াচ্ছেন। হয়তো তারা কোনোদিন ধরা পড়বে না।

বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ থেকে

দেবদূত

– মাহবুবুর রহমান ভূইয়া মনজু

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ হলেও আমার বাড়ির ত্রিসীমানা তথা তিন কিলোমিটারের কাছেও নদী নেই। কথায় আছে, *বিপদে বাঘেও ঘাস খায়, বিড়ালও গাছে ওঠে*। তেমনি নদী বিহীন এলাকার মানুষ এই আমি যার পক্ষে নৌ ভ্রমণ অকল্পনীয় হলেও নৌ ভ্রমণের সুযোগ হয়ে যায় একদিন।

১৯৭১ সালে যুদ্ধের ডামাঢোলের মাঝে মে–জুন মাসের বর্ষণমুখর একদিনে। অবশ্য এ নৌ ভ্রমণ আনন্দের তো ছিল না, বরং ছিল বাচার তাগিদে যাত্রা। বিপদ চিন্তা সবার মাঝে হলেও ঘটনার আকস্মিকতায় আমার কাছে আনন্দের ভ্রমণ ছিল সেটা।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসররা গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিচ্ছিল প্রতিদিন। কিছু কিছু বাড়ির দরজায় বাংকার বানাতে শুরু করে। ফলে ওই সমস্ত বাড়ি, গ্রামের আমজনতা জান বাচানোর তাগিদে যে যেদিক পারে পালাচ্ছে। আমাদের বাড়ির তিন দিকে তারা বাংকার বানালো, রাজাকারদের শান্তি কমিটির ক্যাম্প হলো।

বাবা দেখলেন আর থাকা যাবে না বাড়িতে। সিদ্ধান্ত নিলেন আমাদের এক দূরসম্পর্কের খালার বাড়ি যাবেন সবাইকে নিয়ে। কিন্তু ওই বাড়িতে যেতে হলে নৌকা ছাড়া উপায় নেই। তাও যেতে হলে প্রত্যুষ প্রহরে যাত্রা করা চাই।

দিনক্ষণ ঠিক করে খুব ভোরে বাবা যৎসামান্য খাবার আর দরকারি কিছু জামা–কাপড় সঙ্গে নিয়ে আমাদের আট ভাই–বোনের বহর নিয়ে রওনা দিলেন। মহুরি নদীতে তখন ডিঙি নৌকা ছিল বেশি, বড় নৌকা একদম ছিল না। বাবা বড় একটা ডিঙি নৌকা ভাড়া নিলেন যার মাঝি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ এক চাচা। পাছে রাজাকার পিছু নেয় এ ভয়ে ভোরে যাত্রা।

আমাদের বহরে ষষ্ঠ নাম্বারে আমি ছাড়াও ছিলেন আমার সদ্য বিবাহিতা দুই বোন। তাই মা ছিলেন খুবই সন্ত্রস্ত। নৌকার মাঝিকে আগেই সাবধান করা হয়েছে, ভাড়া বেশি লাগলে আমরা দেবো তবু নদীর পাড় থেকে কেউ ডাকলে যেন শোনা না হয়।

কথা মতো মাঝিও ভোরের রক্তিম আলোতে দাড় বাইতে শুরু করলেন। নদীর পানিতে ছোট ছোট ঢেউ আর মৃদু বাতাসে ভ্রমণটা প্রথমেই ভালো লাগার পরশে ভরে গেল। নৌকা চলছে, পানিতে রক্তিম সূর্যের প্রথম আলোর আভা ছড়িয়ে পড়ছে। দূরে নদীর পাড় ঘেষে ফজর নামাজ পড়ুয়া জনা দুই তিনজন মানুষ দৃষ্টিগোচর হচ্ছেন। সব কিছু ছাড়িয়ে পলায়নপর আমরা আল্লাহর নাম জপে চলেছি।

দেখতে দেখতে নৌকা এগিয়ে গিয়ে মোহনা ছেড়ে বড় নদীতে পড়লো। শো করে আমাদের নৌকার পাশ ঘেষে আরেকটা নৌকা বিপরীত দিকে চলে গেল। ধাবমান নৌকায় দেখলাম একদল তরুণ অস্ত্র হাতে বসে আছে। বুঝলাম বাংলার দামাল ছেলেরা অজানা কোনো শত্রুর শিবিরে হানা দিতে যাচ্ছে। হঠাৎ আমাদের ডিঙিটা স্রোতের ঘূর্ণিতে পড়ে দুলতে লাগলো। নৌকার গলুইতে বসা এই আমি টাল সামলাতে না পেরে পানিতে পড়ে গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমার অবিবাহিতা বোন মীনাপু পানিতে লাফ দিয়ে পড়ে আমাকে টেনে নৌকায় ওঠালেন।

এদিকে বাবা তো রাগে মাঝি ব্যাটাকে গালি দিতে লাগলেন। এমনি করে যখন জীবন বাচালাম তখনই সাক্ষাৎ পেলাম যমদূতের।

পেছন থেকে জনাপাচেক অস্ত্রধারী রাজাকারের একখানা নৌকা এসে আমাদের ঘিরে ধরলো। আমার বোনদেরকে তারা শুরু করলো টানাটানি। সাগরে ভাসমান মানুষ পেলে হাঙর আর কুমির যা করে তার চেয়েও ভয়ংকরভাবে।

বাবা এবং বড় ভাই সমানে বোনদের রক্ষা করে চলেছেন।

যখন আমার বোনদের বাচানোর উপায় খুজে পাচ্ছিলাম না তখন ফিরে এলো দেবদূতের দল। ঘণ্টা খানেক আগে চলে যাওয়া দামাল ছেলেদের নৌকাটা ফিরে এলো। সব কয়টা রাজাকারকে নদীর পানিতে লাশ বানিয়ে আমাদের রক্ষা করলো। আমাদের ঘটনা শুনে তারাই দায়িত্ব নিয়ে আমাদের খালার বাড়ি নির্বিঘ্নে পৌছে দিয়েছিল।

খালার বাড়িতে যুদ্ধের বাকি দিনগুলো কাটালাম। দেশ স্বাধীনের পরেই বাড়ি ফিরে আসি।

মালিপুর, ফেনী থেকে

ইট বৃষ্টি

– সবুজ দত্ত

তখন সবেমাত্র এসএসসি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। মনটার মধ্যে বেশ উড়ু উড়ু ভাব।এমন সময় আমরা কয়েক বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম নৌকা ভ্রমণে যাবো। তাই যাওয়ার সকল প্রকার আয়োজন শেষ হলো।

ভ্রমণের দিন খুব সকালে আমরা সাত আটজন একত্রিত হলাম এবং আমাদের নৌকাঘাট থেকে একটা নৌকা ভাড়া করলাম সারা দিনের জন্য একশ টাকা। যথাসময়ে আমরা রওনা হলাম।

গরমকাল। তাই আট নয়টা বাজতে না বাজতেই প্রচণ্ড রোদ উঠে গেছে।

আমাদের নৌকাটা স্রোতের প্রতিকূলে। এগাতেই চাইছে না। প্রচণ্ড রোদ পড়েছে। আমরা সবাই হাফপ্যান্ট পরে খালি গায়ে মাঝির সঙ্গে নৌকা চালাতে সাহায্য করছি। কেউ কেউ উচু স্বরে গান গাইছে। বারোটার সময় আমাদের নৌকা ঠিক যে জায়গায় সেই জায়গাটার নাম দিয়াপাড়া।

আমরা নদীর কিনারা দিয়েই যাচ্ছি। এমন সময় কিছু মেয়ে নদীতে নেমেছে গোসল করার জন্য। আমাদের হাল দেখে অর্থাৎ প্রখর রোদে পরনে হাফপ্যান্ট খালি গায়ে নৌকা বাইছি এটা তাদের খুব আনন্দ দিয়েছে।

আমাদের ভেতর থেকে অনেকেই এ দৃশ্য দেখে ওই মেয়েদেরকে বিভিন্ন উত্তপ্ত কথা বলেছে।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের গন্তব্য পৌছে যাই। সেখানে নেমে খাওয়া–দাওয়া, ছবি তোলা ইত্যাদি। বেশ মজা করে সন্ধ্যা নাগাদ আমরা রওনা হই। আমাদের নৌকাটা এখন স্রোতের অনুকূলে চলছে খুব ধীরে ধীরে।

দিনের ধকল শেষে আমরা সবাই নৌকার উপরে শুয়ে পড়েছি। শুয়ে শুয়ে চাদ দেখছি। আধখানারও বেশি চাদ থাকা সত্তেও বেশ অন্ধকার চারদিকে। এমন সময় হঠাৎ একটা ফিস ফিস গলার আওয়াজ।

প্রথমে একবার শুনেছি গুরুত্ব দিইনি।

পরক্ষণে আবার, এই ছেলেরা শুনছো?

ঠিক তখনই চোখে পড়লো নদীর কিনারার দিকে। দেখি এক মধ্য বয়স্ক মহিলা হারিকেন হাতে বসে আছেন।

মহিলার পরবর্তী উক্তি ছিল, তোমরা নদীর ওপাশ দিয়ে যাও। কিছু ছেলেরা তোমাদের মারার জন্য বসে আছে।

সকালে যখন আমরা কিছু মেয়েদের উত্তপ্ত করার কথা বলেছিলাম তখন ভাগ্যক্রমে ওই এলাকার (দিয়াপাড়া অর্থাৎ ডেয়ারিং এলাকা) কিছু দামাল ছেলেরা সেটা দেখেছে। আর সে জন্যই...।

এ কথা শোনামাত্র আমাদের ভেতরে যেন এক পলক ঝড় উড়ে গেল। বিদ্যুৎ গতিতে মাঝিকে নদীর অপর পাশে নৌকা নিতে বলা হলো।

আমাদের নদীটা চওড়ায় খুব একটা বড় ছিল না। পার হওয়ার সময় যখন মাঝ নদীতে ঠিক তখনই শুরু হলো *ইট বৃষ্টি।* আমরা জীবনে প্রথম সেদিন ইট বৃষ্টি দেখেছিলাম। নদীর ওপার থেকে হই হই চিৎকার আর ইটের বড় বড় টুকরো ছুড়ছে সেই সব দামাল ছেলেরা।

ঠিক তখনই আমাদের ভেতর থেকে একজন জোরে জোরে চিৎকার করছে, ওরে বাবা, মাথা ফেটে গেছে। হয়তো এটা শোনার পর বৃষ্টিটা কিছুটা কমেছিল।

পরক্ষণেই জানলাম আসলে আমাদের বন্ধুটা নাটকীয়ভাবে ওরে বাবাটা করেছে। যাহোক, তার ওই অভিনয়টা তাৎক্ষণিকভাবে কিছুটা কাজে লেগেছিল।

ওই জায়গা থেকে আমাদের ঘাট এক ঘণ্টার পথ। কিন্তু আমরা ওই পথ দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌছে গিয়েছিলাম। এটা খুবই আশ্চর্যজনক কথা! ঘাটে নামার পর আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কোনোদিন ওই দিকে নৌকা ভ্রমণে যাবো না বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম। বুঝলাম *যেমন কর্ম তেমন ফল।*

অভয়নগর, নওয়াপাড়া, যশোর থেকে

প্রতিবন্ধী

– প্রতীতি শিরীন

২০০০ সালের কথা। অধ্যাপিকা মায়ের কলেজ থেকে ঠিক করা হলো সব শিক্ষকেরা একদিনের জন্য ফেরিতে করে বুড়িগঙ্গা ভ্রমণে যাবেন। সঙ্গে থাকবে চাদার টাকা বাবদ ভূরিভোজন এবং ফাও নাচ–গান, আনন্দ ও মায়ের কিশোরী কন্যা এই আমি।

নির্দিষ্ট দিনে সকালবেলায় কলেজ বাসে করে হই চই করতে করতে সবাই ঘাটে এলো। বিশাল দোতলা ফেরি ছাড়তে ছাড়তে বেলা এগারোটা সাড়ে এগারোটা। প্রথম সুযোগেই ডেকে গিয়ে কায়দা মতো একটি আসন নিলাম। চনমনে রোদে বুড়িগঙ্গার মুক্ত বাতাসে আমার খোলা চুল, কাপড় পতাকার মতো পত পত করতে থাকলো। পানির দুলুনি আমাকে নিমগ্ন করে তুললো।

ধ্যান ভাঙলো আমার কিছু পাশে কারো মৃদু কথোপকথনে। তাকিয়ে দেখি সতেরো আঠারো বছরের সুদর্শন এক তরুণ অপর একটি ছেলের সঙ্গে কথা বলছে। পরের জনকে ভৃত্য স্থানীয় কেউ মনে হলো।

পাশাপাশি দাড়িয়ে আমরা ঘন ঘন একে অপরের দিকে তাকাচ্ছি। শেষে সমস্ত লজ্জা ঝেড়ে ফেলে আমিই জিজ্ঞাসা করলাম তার নাম এবং সে কি পড়ে।

উত্তরে জানালো, নবীন। সে এইচএসসি দিয়েছে।

এই বাক্যটিতে তার কথায় কিছুটা জড়তা উপলব্ধি করলাম। ভাবলাম কথা বলতে হয়তো কিছুটা অসুবিধা আছে। আমাদের কথাবার্তা আর এগোলো না।

কিছুক্ষণ পর মা আমাকে নিয়ে গেলেন প্রিন্সিপালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য।

অবাক হয়ে দেখি সেই ছেলেটি তার ক্যাবিনে। প্রিন্সিপালই পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আশরাফুল। আমার ছেলে।

জানলাম ছেলেটি প্রতিবন্ধী।

কথাটি আমার বুকে ধাক্কা দিল। এতো সুন্দর একটি ছেলে মানসিকভাবে পরিপক্ব নয়! তা কি করে সম্ভব?

খাওয়া–দাওয়ার পাট চুকিয়ে সাংস্কৃতিক আসরে নাচ–গান ও লটারি খেলায় পরবর্তীকালে লক্ষ্য করেছি নবীনের সরব পদচারণা ও অদম্য উৎসাহ। হাস্যোজ্জ্বল মুখে সে লটারির টিকেট দিচ্ছিল সবাইকে। আমাকেও একবারে তিন চারটি ধরিয়ে দিল। আমাদের সবার আনন্দে ছিল তার অকৃত্রিম অংশগ্রহণ।

ইতিমধ্যে আমারও অন্য কিছু মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। শেষ বিকেলে অস্তমান সূর্যের আলোয় ছাদে দাড়িয়ে তাদের সঙ্গে গল্প করছি। খেয়াল করলাম কিছু দূরে নবীন দাড়িয়ে আছে। এবার সে একা। বার বারই আমাকে দেখছে। তার কাছে গেলাম না। কথা বললাম না। তাকে না দেখার ভান করলাম। কারণ সে ভিন্ন। সে আমার মতো নয়। তার জগৎ আমার জগৎ এক নয়।

আজ এতো দিন পরে বুঝেছি আমার ভুল। এই নিঃসঙ্গ মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলেটির পাশে আমার দাড়ানো উচিত ছিল। সে আমার বন্ধুত্ব কামনা করেছিল। মুখে সে কিছু বলেনি। তবে তার দৃষ্টি বুঝিয়ে দিয়েছিল তার অনুভূতি। নবীনের মা তার সর্বোচ্চ সামাজিক মর্যাদাকে ব্যবহার করে নবীনের যত্ন ও বেচে থেকে খাবার মতো

প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারলেও নিতে পারেননি তার একাকীত্ব থেকে তাকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। এর কারণ পুরোটাই আমরা ও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রতিবন্ধীদের দিকে উচিত আমাদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করা। কিন্তু আমরা তা করি না। সেটা শিখি না বলে। এ জন্য কৈশোরে প্রদর্শিত আমার সংকীর্ণ মনমানসিকতার নিদর্শন অনেক সময়েই স্থায়ী অপরিপক্বতায় রূপ লাভ করে বেশির ভাগ পূর্ণ বয়স্কতে। তাহলে সেই প্রতিবন্ধী আর তথাকথিত শিক্ষিত, উদারমনা এই আমাদের মাঝে ফারাক রইলো কোথায় যেখানে আমরা স্রেফ আমাদের গোড়ামির ফলে প্রকৃত প্রতিবন্ধী। আসুন, আমরা সুস্থ মানুষেরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাই। এতে বদলে যেতে পারে অনেক বঞ্চিত মানুষের জীবন।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

হঠাৎ এক রাতে

– ইলিয়াস পাঠান

শৈশবে সলিল সমাধির দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে বরাবরই পানিকে আমার ভয়। তাই আজো পর্যন্ত সাতার শেখা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করার আগ্রহ যেন মাঝে মধ্যে সেই ভয়কেও ছাপিয়ে যায়। যাকে বলে *যাতনে জ্বলিয়া মরি* অবস্থা। তখনই বেরিয়ে যাই কখনো নৌকা নিয়ে, কখনো বা লঞ্চে চেপে চলে যাই বরিশালে বন্ধুর বাড়িতে। তেমনি এক ভ্রমণ কাহিনী।

তারিখটা স্পষ্ট মনে না থাকলেও দিনের নামটা ভালোভাবেই মনে আছে। রবিবার রাত। সারা দিন বরিশালে বন্ধুদের সঙ্গে কাটানোর পর তাড়াহুড়া করে রাতের শেষ লঞ্চটা ধরলাম। উদ্দেশ্য ঢাকা সদরঘাট। ক্যাবিনে ছোট ব্যাগটা রেখে সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে সৌন্দর্য শিকারে বাইরে এসে দাড়ালাম। সিগারেট জ্বলছে হাতে। পাশ থেকে হঠাৎ এক কণ্ঠস্বর।

এক্সকিউজ মি। ম্যাচটা প্লিজ।

কিঞ্চিত অবাক হলাম কণ্ঠস্বর শুনে।

শিওর। বলে জলন্ত সিগারেটটাই হাত বাড়িয়ে দিলাম। হাত বাড়িয়ে নেয়ার সময় লক্ষ্য করলাম তার কম্পমান হাত দুটো যেন তার ইচ্ছার প্রচণ্ড বিরোধিতা করছে।

এবার ম্যাচটাই বাড়িয়ে দিলাম।

সিগারেট ফেরত দিয়ে ম্যাচ দিয়ে সিগারেট ধরালো।

বললাম, ধূমপান মেয়েদের বেশ দৃষ্টকটু লাগে।

সচরাচর দেখতে পান না বলেই অস্বাভাবিক আর অস্বাভাবিকতা থেকেই দৃষ্টকটু। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর।

হ্যা, তাই হবে মনে হয়।

আকাশের দিকে আবার চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। প্রায় আধা ঘণ্টার মতো কেটে গেল।

মেয়েটা এবার বাইরে বেরিয়ে আমার পাশে এসে দাড়ালো। কি নাম আপনার? আমার দিকেই প্রশ্ন।

আমি তূর্য।

আমার প্রশ্নবোধক চাহনিতে জবাব এলো, আমি নদী।

কিন্তু আশ্চর্য, আপনি কি জানেন, এ নদীতেই আপনাকে খুব বেশি বিষণ্ন দেখাচ্ছে?

শুকনো হাসিতে কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে এলো, *নদীই আমার সর্বনাশ।*

বললাম, নদী তো তার নিজস্ব গতিতেই চলে। সর্বনাশের পেছনে আপনার অবশ্যই কোনো ত্রুটি রয়েছে। নদীকে দোষ দেয়া উচিত নয়।

তবে কাকে দোষ দেবো? আমার দেশকে? নাকি দেশের সরকারকে? নাকি মন্ত্রীদেরকে? নাকি লঞ্চটাকে।

(নিঃশ্বাসের শেষান্তে) নাকি নিজের ভাগ্যকে?

তার প্রশ্নগুলো আমার কানে সজোরে বিধতে লাগলো। চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার মুখের বিষণ্ণতার আধার যেন পূর্ণিমা রাতের আলোকেও ম্লান করে দিতে চাইছে। নিঃশ্চুপ চারদিকে। কারো কোনো কথা নেই। মৌনতা যেন ফিশ ফিশিয়ে কি বলতে চাইছে, বোঝাতে চাইছে তার ভেতরের চাপা ব্যথাগুলোকে।

হঠাৎই সে আবার বলতে শুরু করলো। যা বললো তা হলো, দীর্ঘ তিন বছরের প্রেমের সফল পরিণতিতে গত ছয় মাস আগে নদীর বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের চার মাসের মাথায় দুর্ঘটনা। এক লঞ্চ দুর্ঘটনায় তাদের দুজনের মধ্যে চিরবিচ্ছেদ। স্বামীর লাশটা পর্যন্ত খুজে পায়নি সে।

ঘটনা শোনার পর আমার অনেকটা সময় কেটে গেল নিঃশব্দে। একটার পর একটা সিগারেট। সহানুভূতি, সমবেদনা কোনো কোনো ব্যথাকে বাড়িয়ে তোলে। তাই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে জিজ্ঞাসা করলাম, কি করেন এখন?

জাপান চলে যাবো চাচার কাছে।

বললাম, না থাক, আপাতত নিচেই চলুন। ঘুমাবেন।

হেসে সে তার ক্যাবিনের দিকে পা বাড়ালো।

সকালে উঠেই একখানা মেসেজ পেলাম।

ধন্যবাদ। আপনার ম্যাচটির জন্য। ম্যাচটি নিয়ে গেলাম। আবার দেখা হলে ফেরত পাবেন।

আমি ভেবে পাই না কোথায় দেখা হবে আমাদের!

মহারাষ্ট্র, ইনডিয়া থেকে
elias_no_tears@yediffmail.com

জলতরঙ্গ

– ফরিদা মনি

তখন খুলনায় থাকি স্বামীর চাকরিস্থলে। ঢাকায় যাওয়া–আসা সর্বদাই স্থলপথে। নৌপথে চমৎকার যাতায়াত ব্যবস্থা থাকলেও আমার পানিভীতির কারণে কখনোই স্টিমার ভ্রমণ সম্ভব হয়নি।

আমার স্বামী নৌপথই বেশি পছন্দ করতেন। বলতেন এর চেয়ে আরামের আর কিছু আছে নাকি? যা সুন্দর ক্যাবিন। একটা সঙ্গী না হলে হয়? একা রাতে থাকা ভীষণ কষ্টকর। এতো মনে পড়ে তোমাকে! চলো না গো।

যখন কিছুতেই কিছু হয় না তখন শুরু করতেন ভয় দেখানো, শোনো, যদি না যাও তাহলে দেখি কোনো সঙ্গিনী পাওয়া যায় কি না? আপত্তি নেই তো? অনেক সহজলভ্য, অল্প বয়সী, সুন্দরী। বেশি খরচও নেই। কি বলো? নেবো?

যদিও ঝট করে উত্তর দিই, নাও না, মানা করেছে কে? জানি হয়তো নেবে না তবু শোনার পর থেকে মনের মধ্যে সন্দেহের কাটা খচ খচ করে।

এরপর থেকে যতোবারই সরকারি সফরে কর্তার জন্য রকেটের টিকিট কাটা হয়েছে, গোপনে সেক্রেটারির কাছ থেকে খোজ নিই সিঙ্গল ক্যাবিন, নাকি ডাবল সিটের টিকেট কাটা হয়েছে। যদিও প্রতিবারই সন্দেহের নিরসন ঘটে একটা টিকিট শুনে তবুও সন্দেহ!

যাহোক, সন্দেহের বিষের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে একদিন নৌপথে ভ্রমণে রাজি হয়েই গেলাম। সম্মত হওয়ার কারণ একটাই, সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা।

এদিকে বলে নেয়া ভালো যে, আমার আর কর্তার বয়সের পার্থক্য বারো বছরের। যে বছর স্টিমার ভ্রমণ করলাম তখন আমার চৌত্রিশ এবং তার ছেচল্লিশ। আমি তিন সন্তানের জননী। তবু ছিমছাম গড়নের জন্য সবাই বলতো আমাকে পচিশ, ছাব্বিশের বেশি মনেই হয় না। অনেকেই আকৃষ্ট হতো এবং মাঝে মধ্যে বিয়ের প্রস্তাবও আসতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কর্তাকে মনে হতো পঞ্চাশ ষাট বছর। উপরন্তু চুলগুলো প্রায় সবই শাদা। এর জন্য কর্তা বেশ বিব্রত থাকতেন।

যাহোক, বুড়ো কর্তার উল্টাপাল্টা রোমান্স মন্দ লাগছে না। বন্ধ ক্যাবিন থেকে বেরিয়ে সামনে খোলা ডেকে গিয়ে দুজনে বসলাম। শেষ বিকেলের কনে দেখা আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত। নদীর তিরতিরে জলের রেখায় সূর্যের আলো সোনার মতো চিক চিক করছে। মৃদু সমীরণ। সব মিলিয়ে মুগ্ধ হওয়ার মতো পরিবেশ।

এমন সময় স্টিমার বরিশালে ভিড়লো। অনেক যাত্রীর সঙ্গে একদল তরুণ হই চই করতে করতে উঠলো। একেবারে ডেকে এসে হাজির। যদিও এখানে সাধারণ যাত্রীদের প্রবেশ নিষেধ। তাদেরকে দেখেই কর্তা ভ্রূ কুচকালো বিরক্তিতে। আমার ভালোই লাগছিল তাদের তারুণ্যের উচ্ছ্বাস। নিজেদের মধ্যে নিরন্তন কথা বলছে, হাসাহাসি করছে।

একটি ছেলেকে চোখে পড়লো। খুবই ছটফটে। এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই, একটার পর একটা সিগারেট খেয়েই চলেছে। ফাকে ফাকে আড়চোখে চোরা দৃষ্টি হানছে আমার দিকে। চোখের ভাষায় কিছুটা উৎসুক, কিছুটা মুগ্ধতা। মনে মনে হাসি পাচ্ছিল। আমাকে *বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা* ভাবছে না তো!

বুঝলাম কথা বলতে চায়, আলাপ করতে চায়। লাইন মারা ও দুষ্ট বুদ্ধি থাকতে পারে।

কর্তারও বোধ করি চোখ পড়েছে বিষয়টিতে। স্ত্রীর দিকে কারো মুগ্ধ দৃষ্টি চিরকালই তার গাত্রদাহ। কিছুটা উস-খুস করে ঠেলা দিল আমাকে।

এই চলো, ক্যাবিনে যাই। কোথা থেকে যে উৎপাতগুলো জুটলো!

আমি ছেলেটার সঙ্গে কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছিলাম না। তাই কর্তাকে বললাম, তুমি যাও, আমি আসছি।

কর্তা একটু নাখোশ হয়েই গাত্রোত্থান করলেন।

ভাবলাম দেখিই না জিজ্ঞাসা করে এদের পরিচয়!

হা করতেই সেই ছেলেটি লাফ দিয়ে পড়লো, আমরা! আমরা বরিশাল মেডিকাল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। ঢাকায় যাচ্ছি ছুটিতে। আমি! আমি স্বপন। বলেই লাজুক মুখে হাসলো।

আমি হেসে বললাম, ও তুমি স্বপন! তা তুমি এতো সিগারেট খাও কেন?

কথা শেষ না হতেই আধা খাওয়া সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে পা দিয়ে নেভাতে নেভাতে বললো, এই যে, আজ থেকে আর খাবো না। একেবারে বন্ধ।

লক্ষ্য করলাম স্বপন আমার সঙ্গে আপনি, তুমি কোনো সম্বোধন শব্দ ছাড়াই খুব সাবধানে কথা বলছে। তার এতো বাধ্যতা দেখে অবাক হয়ে বললাম, আমার কথাতেই এতো দিনের অভ্যাস ছেড়ে দিলে? কতোটুকু চেনো আমাকে?

স্বপন জবাব দিল, কাউকে ভালো লাগলে এমনই হয়।

একটু কৌতুকের স্বরে বললাম, তাই নাকি? তা...।

বাধা পড়লো কর্তার ডাকে।

স্বপন ক্যাবিনের দিকে ইশারা করলো, ওই যে আব্বা ডাকছে।

হাসতে হাসতে বললাম, দূর পাগল, তিনি আমার স্বামী।

মুহূর্তে! স্বপন বিষণ্ন স্বরে বললো, যাহ তাই হয় নাকি? ঠাট্টা ভালো লাগে না।

বললাম, সত্যি, আমার বড় বড় ছেলে আছে।

স্বপন অবিশ্বাসের স্বরে বললো, সত্যি! ওই বুড়োটা আপনার স্বামী? আপনাকে আমার যা ভালো লেগেছিল, মনটাই খারাপ করে দিলেন। বলেই ধুপ করে আমার দুই পা ছুয়ে সালাম করলো। করুণ স্বরে বললো, দোয়া করে আপনার মতো কাউকে যেন পাই। প্রেমিকা হিসেবে না-ইবা পেলাম, বোন হতে তো বাধা নেই? আপা, বাসায় গেলে তাড়িয়ে দেবেন না তো?

আবেগের একটা দলা বুকের মাঝে কেমন করে উঠলো। ঝাপসা চোখে তার মাথায় হাত রাখলাম। মনে মনে বললাম, তাই যেন হয়।

ইচ্ছা করলো পরম মমতায় তাকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে বলি, ভালো তো আমারও লেগেছিল।

কিন্তু?

গুলশান, ঢাকা থেকে

বিচিত্র

– দিলরুবা সাঈদ সিক্তা

মগবাজারে ষোল মাস বয়সী শিশু আরিয়ানকে পাওয়া গিয়েছে ট্রাংকের ভেতর। আশপাশে এতো অক্সিজেন থাকতেও (যদিও বিশুদ্ধ না) এই নিষ্পাপ শিশুকে ট্রাংকের ভেতর অক্সিজেনের অভাবে মারা যেতে হয়েছে। যে পাষণ্ড এ কাজ করেছে তাকে সবাই ধিক্কার জানায়। সে খুবই খারাপ কাজ করেছে। কিন্তু তার পেছনে একটা কারণ ছিল তা হচ্ছে, সে নেশাখোর এবং নেশার টাকার জন্যই সে বাচ্চাটিকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায় করতে চেয়েছিল। সম্ভবত তার মেরে ফেলার কোনো ইচ্ছা ছিল না।

সে যাই হোক। তার যাই ইচ্ছা ছিল না কেন, বর্তমানে সে একজন ঘাতক এবং তার কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত।

ঘটনা প্রায় একই রকম। নিশ্চিত মৃত্যু ফাদ মেঘনা, শীতলক্ষ্যার মতো নদীর পানিতে ডুবে অক্সিজেনের অভাবে মারা যাচ্ছে শ শ লোক প্রতি বছর। না নিয়মে কোনো ফাক নেই। নিয়ম নিয়মের মতোই আছে। শুধু নেই কার্যকর। আরিয়ানের ঘটনার সঙ্গে এই ঘটনার পার্থক্য হচ্ছে এই, মানুষ মেরে ফেলার পেছনে কোনো কারণ নেই, নেই কোনো স্বার্থ। অভাব শুধু আন্তরিকতার। প্রশাসন নির্বিকার, অথচ এমনটি তো হওয়ার কথা ছিল না!

১৯৮৬ সালের জুন মাসে তৎকালীন সরকার ইন্টারন্যাশনাল মেরিন অরগানাইজেশন থেকে এক্সপার্ট নিয়ে আসে লঞ্চ ডুবির সম্ভাব্য কারণ খুজে বের করার জন্য। এক্সপার্টরা সাত দিন গবেষণা করে একটি রিপোর্ট পেশ করে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৮৬ সালের মধ্যেই সতেরো সদস্য বিশিষ্ট একটি প্যানেল গঠিত হয়। সেই প্যানেল অনেক নিয়ম করলেও সেগুলো খুব একটা কার্যকর ছিল না। অর্থাৎ এতে সমস্যা ছিলই। পরবর্তীকালে বিআইডাবলিউটিএ (বাংলাদেশ ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট অথরিটি) লঞ্চ মালিকদের তিনটি বিষয়ে একজন বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা অনুমোদন করে নেয়ার জন্য জোরালো পদক্ষেপ নেয়। বিষয় তিনটি হলো – *এক.* স্থায়ী এবং ঝুকি সহ্য করার ক্ষমতা। *দুই.* বাহিত ভার সহ্যকারী। এবং *তিন.* নিরাপদ নির্মাণ বা গঠন কৌশল। কিন্তু এখনো বিষয়গুলো সঠিকভাবে মানা হচ্ছে না। কারণ সতেরোজন সদস্যের মধ্যে অল্প সংখ্যক সদস্য ডিজাইন ও অন্যান্য সব পরীক্ষা করে সার্টিফাই করেছে।

বেশির ভাগ সদস্যই এখন দেশের বাইরে অবস্থানরত। তাই শত নিয়মের মধ্যেও কোনোই লাভ হয়নি। বরং প্রতি বছর নৌপথে দুর্ঘটনা ঘটেই চলছে। না ভাঙছে প্রশাসনের ঘুম, না হচ্ছে কারো সাজা। সব সম্ভবের এ দেশে এর উল্টোটাই দেখা যায় অর্থাৎ মানুষের প্রাণ বাচানোর জন্য শাস্তি পেতে হয়েছিল এই ব্যক্তিকে।

বেশ কিছু দিন আগের কথা। যমুনাতে তখন বৃজ হয়নি। তাই আমরা লঞ্চেই পার হচ্ছিলাম। এমনিতেই বর্ষাকাল তার ওপর যাত্রী বেশি হওয়ায় লঞ্চটা সামান্য ঢেউতেই খুব দুলছিল। বিশেষ করে যদি পাশ দিয়ে অন্য কোনো লঞ্চ বা ইঞ্জিনচালিত নৌকা যায় তাতে লঞ্চের যা অবস্থা হয় সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না! লঞ্চচালককে বার বার বলা হচ্ছিল কোনো চরে লঞ্চ থামাতে। কারণ এভাবে হয়তো বেশিক্ষণ টিকে থাকা যাবে না। কিন্তু চালক কোনো ভ্রুক্ষেপ করছিল না।

আমার মা সারাক্ষণ দোয়া-দরুদ পড়ছিলেন। সেই দোয়া-দরুদের কারণেই হয়তো আমরা সিরাজগঞ্জ ঘাটের কাছাকাছি চলে এলাম। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো সেখানেই। যেহেতু ঘাটের কাছাকাছি অন্যান্য লঞ্চ ও নৌকার চলাচল বেশি ছিল, তাই আমাদের লঞ্চের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে গেল।

এমন অবস্থায় চালককে প্রায় জোরপূর্বক কাছের একটা উচু চরে লঞ্চ নিতে বাধ্য করলেন এক ভদ্রলোক।

চালক খুবই নাখোশ হয়ে চরের দিকে লঞ্চ ঘোরালো।

কিন্তু পৌছানোর আগেই ঝপাং করে লঞ্চটা ডুবে গেল।

যেহেতু চরের কাছাকাছি ছিল, তাই বেশ কিছু লোক নদীতে ঝাপ দিয়ে সাতরিয়ে চরে পৌছান। হঠাৎই কিছু ভার কমে যাওয়ায় এক ঝটকায় লঞ্চটি আবার পানিতে ভেসে উঠলো।

যাহোক, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খুবই কম ছিল। সবাই সেই ভদ্রলোককে খুব করে ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন শেষ মুহূর্তে এ রকম একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য।

ঘটনা এখানে শেষ হলে খুবই ভালো হতো। কিন্তু তা হয়নি। আসল ঘটনা আরো পরে। বাকি পথটুকু আমরা নৌকাতেই পার হলাম। সিরাজগঞ্জ ঘাটে পৌছাতে না পৌছাতেই আমরা দেখলাম সেই লঞ্চের চালকসহ অন্যান্য লোক সেই ভদ্রলোকটিকে আচ্ছা মতো মারছে। ফর্শা লোকটি মুহূর্তে রক্তে ভিজে গেলেন। সম্ভবত জোর করে চরে লঞ্চ নেয়ার জন্য এই আক্রোশ।

অবাক হয়ে দেখলাম লঞ্চের যাত্রীসহ অন্যান্য লোক এই ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত এক মহিলা সামনে গিয়ে দাড়ালেন। হাত জোড় করে বললেন, ভাই মাফ করে দেন তাকে, দয়া করে আর মারবেন না।

একজন বয়স্ক বোরখা পরিহিতা মহিলার আকুতির কারণেই বোধ হয় তখন তারা ক্ষমা করলো। আমি আনন্দিত, গর্বিত যে, সে মহিলা আমার মা। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমার মনে আজও বাজে, আমার মা কেন ক্ষমা চাইলেন? এতোগুলো লোকের জীবন বাচানোর জন্য?

কি বিচিত্র এ দেশ! সত্যিই সেলুকাস!

গাজীপুর থেকে

অপরাধ বোধ

– নূরে আলম

১৯৮৯-এর ঘটনা। লঞ্চে করে খুলনায় যাচ্ছিলাম। ছাদে মাগরিবের নামাজ পড়ে কিছুক্ষণ বসলাম তাবলীগিভাইদের বয়ান শোনার জন্য।

পাশের এক ভদ্রলোক তার ভাতিজাকে আমার কাছে বসিয়ে বললেন, একটু খেয়াল রাখবেন, নিচ থেকে আসছি।

ভাতিজার বয়স বারো তেরো বছর। আমি সায় জানালাম।

বয়ান শেষে দোয়ার পর ভদ্রলোককে দেখলাম।

জিজ্ঞাসা করলেন, ভাতিজা কোথায়?

আশপাশে তাকিয়ে দেখি ভাতিজা গায়েব। কখন ছেলেটা উঠে গেছে খেয়াল করিনি।

তাড়াতাড়ি উঠে দুজনে খোজা শুরু করলাম। অনেকক্ষণ খোজার পরও পুরো লঞ্চে ভাতিজার হদিস মিললো না।

মনে মনে ভীষণ অস্থির এবং শংকিত হচ্ছিলাম এই ভেবে যে, পানিতে পড়ে যায়নি তো? ভদ্রলোককে হালকাভাবে একটু জিজ্ঞাসা করলাম, ভাতিজা সাতার জানে তো?

তিনি তৎক্ষণাৎ আমার মনের আশংকাকে উড়িয়ে দিয়ে বললেন, পানিতে পড়ার প্রশ্নই আসে না। তবে তার আশংকা ব্যক্ত করলেন যে, লঞ্চের সারেং বা ওই জাতীয় একজন লোকের সঙ্গে ভাতিজার একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল। সে হয়তো কোথাও গুম করে রাখতে পারে। সবচেয়ে সম্ভাবনার কথা বললেন যে, কিছুক্ষণ আগে কালিগঞ্জ বাজারে যখন লঞ্চ থেমেছিল সে হয়তো সেখানে নেমে পড়তে পারে। লঞ্চ ছেড়ে দেয়ায় সে উঠতে পারেনি।

খুব অপরাধ বোধে ভুগছিলাম। ভদ্রলোক ছেলেটাকে বসিয়ে আমাকে খেয়াল রাখতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি তা পারিনি। ভদ্রলোক অবশ্য নিজে চিন্তিত হবার পরিবর্তে উল্টো আমাকেই সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন।

লঞ্চ থেকে নেমে বিদায় নেয়ার সময় ভদ্রলোককে বললাম পরে ভাতিজার কি খবর পাওয়া যায় তা জানাতে।

কিছু দিন পর ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ হলো। ভাতিজা কালিগঞ্জেই নেমেছিল। ঘাটে দেরি করায় লঞ্চ ছেড়ে দেয়। সে আর উঠতে পারেনি। তবে বুদ্ধিমান বলে ঠিকঠাক মতো বাস ধরে পরদিন ঢাকায় নিজের পরিবারের কাছে ফেরত চলে যায়। আমি অপরাধ বোধ থেকে মুক্তি পেলাম।

ল্যাবরেটরি রোড, ঢাকা থেকে

খেয়ার মাঝি

– স্বপ্নচারী

বাবা যে স্কুলে পড়াতেন সেই স্কুল থেকেই আমাদের পড়াশোনার হাতে খড়ি। স্কুল আমাদের বাড়ির পাশের নদীর বিপরীত পাড়ে। নদীপাড় হয়ে স্কুলে যেতে হয়। নদীর পাড় পানিতে ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত খেয়া নৌকা নদীতে থাকতো। তখন খেয়া নৌকায় পার হতাম। দীর্ঘ পাচ বছর খেয়ায় পার হতে গিয়ে একটা ব্যাপার প্রায়ই লক্ষ্য করেছি। যে দিন খুব তাড়াহুড়ো করে এসেছি সেদিন এসে দেখেছি খেয়া হয় নদীর ওপার। না হয় নদীর মাঝামাঝি। এসেই খেয়া পেয়েছি এমন রেকর্ড খুব কম আছে। তাই আমরা বলতাম, *সব জায়গায় দৌড়াদৌড়ি খেয়াঘাটে গড়াগড়ি।*

এই খেয়া নিয়ে রয়েছে একটি ছোট্ট ঘটনা। তখন আমি নাইনে পড়ি। বর্ষার পানি নদীতে কেবল এসেছে। বাদাম তোলার দিন। ক্ষেতে বাদাম তুলে বাড়ি আসছি দুপুরে খাবার জন্য। কামলার বেশ তখন। দুইটি মেয়ে হেটে যাচ্ছে। তার মধ্যে একটা মেয়ে অপরূপা বললে ভুল হবে। এ মেয়েকে কখনো আমাদের গ্রামে দেখিনি।

সামনে পড়তেই মুখ ফসকে বের হলো, ওয়াও! চমৎকার মাল তো।

অমনি মেয়েটি ফোস করে উঠলো। কি বললি? পায়ে জুতা দেখেছিস। চাবকে গায়ের ছাল তুলে নেবো।

আমি তো থ। গ্রামে আমাদের একটা সুনাম আছে। এ ব্যাপারটা তার সঙ্গে একেবারেই বেমানান। চুপ করে চলে এলাম।

মেয়েটিও আর কিছু না বলে চলে গেল।

আমি খেয়ে আবার মাঠে যাবো। খেয়াঘাটে এসে দেখি সেই মেয়ে দুটি খেয়ায় বসে আছে, মাঝি নেই।

আমি খেয়ায় উঠেই খেয়া পানিতে ভাসালাম।

অমনি মেয়েটি আবার ফোস করে উঠলো, খেয়া রেখে কোথায় গেছিলি? আধা ঘণ্টা ধরে বসে আছি।

আমি তো আবার থ। মেয়েটি কি আমাকে খেয়ার মাঝি ভাবছে? সেরেছে। খেয়া কিছু দূর নেয়ার পর আর তো বৈঠা চালাচ্ছি না।

এবার মেয়েটির চোখে মুখে চিন্তার ছাপ।

নৌকা চালাচ্ছো না কেন?

আমার ইচ্ছা। তোর কথা মতো কি নৌকা চালাবো? আমাকে কি তুই মাঝি ভেবেছিস। দাড়া দেখাচ্ছি মজা।

নৌকা ভাটির দিকে চলছে।

এবার তো অনুনয়-বিনয় শুরু হলো।

আমার তো ভাটিতে গেলে অসুবিধা নেই। কারণ আমার বাদাম ক্ষেত ভাটিতেই। তাদেরকেই হেটে আসতে হবে। আবার নৌকায় পার হতে হবে।

কান্নাকাটি শুরু করলো। ক্ষমা চাইলো।

অবশেষে খেয়া তীরে ভেড়ালাম।

কলেজগেট, টঙ্গি, গাজীপুর থেকে

কয়েক ঘন্টা

– মনি অধিকারী

ছুটির দিন। ঘুম থেকে দেরি করে উঠেছি। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। কি করবো ভাবছি। বাইরে বের হওয়া সম্ভব নয়। তখনই মনে হলো আলমারিটা গোছানো দরকার। আলমারি খুলে ভেতরের জিনিসপত্র সব নামিয়ে রাখছি। ফাইলপত্র ঘাটতে হঠাৎ একটা পুরনো ডায়রি পেলাম। ডায়রির মধ্যে কয়েকটা মূল্যবান চিঠি এবং একটি এক টাকা নোট। পাকিস্তান আমলের টাকা। এখন অচল। বেশ কয়েক জায়গায় পোকায় কাটা। ধূসর বিবর্ণ চেহারা। বোঝাই যায় না যে, এটা একটা এক টাকার নোট।

সব কিছু ফেলে রেখে নোটটা হাতে নিলাম। একে একে ভেসে উঠছে চল্লিশ বছর আগের ফেলে আসা স্মৃতি।

সেই ষাট দশকের কথা। আমি তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। থাকি কলেজ হস্টেলে। শরৎ পূজার ছুটি মিলিয়ে অনেক দিন ছুটি। সবারই বাড়ি ফেরার প্রস্তুতি। আমিও সকাল নয়টায় ফুলবাড়িয়া স্টেশনে এলাম।

আমার গ্রামের বাড়ি ফরিদপুর। ঢাকা থেকে ট্রেনে করে নারায়ণগঞ্জ যাবো। ওখান থেকে স্টিমারে গোলালন্দ ঘাট। তারপর আবার ট্রেন। এভাবে ভাটিয়াপাড়া যাবো।

ফুলবাড়িয়া থেকে ভাটিয়াপাড়ার টিকেট নিয়ে গাড়িতে চড়ে বসলাম। গাড়ি নারায়ণগঞ্জ পৌছালো এগারোটায়। স্টিমার ছাড়বে দুইটায়। কিন্তু তখনই অনেক যাত্রী। সবাই বিছানা করে জায়গা দখল করে রাখছে। এটাই নিয়ম।

আমিও একটা বিছানা করে শুয়ে পড়লাম। আমার মাইগ্রেনের সমস্যা। একটু অনিয়ম হলেই মাথা ধরে। লোকজন, কুলি-মজুরের হই চই, ফেরিওয়ালার চিৎকার। অসুস্থ হয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড মাথা ব্যথা। কিছুই ভালো লাগছে না।

এক সময় স্টিমার ছাড়লো। প্রবল বাতাস। কিছুটা ভালো বোধ করছি। মুন্সিগঞ্জে স্টিমার নদীর মাঝখানে দাড়ালো। ছোট নৌকায় করে ফেরিওয়ালারা প্রচুর পরিমাণ সাগর কলা নিয়ে স্টিমারের গায়ে গায়ে লাগিয়ে বিক্রি করছে। ঘরে ফেরা লোকজনরা ইচ্ছা মতো সাগর কলা কিনছে। তখন সাগর কলার খুব সুনাম ছিল। একমাত্র ঢাকা এবং মুন্সিগঞ্জ ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যেতো না। শুধু ঘরে ফেলা লোকজন নয়, কলকাতাগামী যাত্রীরাও আত্মীয়স্বজনের জন্য বহুল পরিচিত সাগর কলা কিনছে।

চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ এবং ফরিদপুর অঞ্চলের লোকজনের কলকাতা তথা ইনডিয়া যাতায়াতের একমাত্র পথ এই স্টিমারে করে গোয়ালন্দ ঘাট হয়ে ঢাকা মেল–এ দর্শনা হয়ে শিয়ালদাহ পর্যন্ত যাওয়া।

মুন্সিগঞ্জের পরে আরো কয়েক জায়গায় স্টিমার থামলো। রাত আটটায় স্টিমার চাদপুর পৌছালো। এখানে এক ঘণ্টা দেরি করবে। অনেক যাত্রী নেমে ঘাটের হোটেল থেকে খাওয়া–দাওয়া করে এলো। প্রচুর ফেরিওয়ালা নানান রকম খাবার নিয়ে স্টিমারে এসেছে। যার যেমন খুশি কিনে খাচ্ছে।

দই–এর ফেরিওয়ালারা দই খান, দই খান বলে চিৎকার করে অতিষ্ঠ করে তুললো।

আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম না এবং কিছু খেলামও না।

ভোর চারটায় স্টিমার গোয়ালন্দ ঘাটে পৌছালো। সবাই যার যার বিছানাপত্র, ব্যাগ, সুটকেস গুছিয়ে নামার জন্য তৈরি হলো।

আমিও প্রস্তুত হলাম।

পাচটা থেকে যাত্রীরা নামতে শুরু করলো।

যাত্রীদের জন্য ঢাকা মেল অপেক্ষা করছে।

তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়লাম। আমি এ গাড়িতে কালুখালি যাবো। ওখানে ফরিদপুর থেকে ছেড়ে আসা ভাটিয়াপাড়াগামী গাড়ি দাড়িয়ে আছে। *ঢাকা মেল*–এর যাত্রীদের নিয়ে ছেড়ে যাবে। গোয়ালন্দ ঘাট কুলি এবং ফেরিওয়ালাদের জন্যে বিখ্যাত। কয়েকশ ফেরিওয়ালা লুচি, হালুয়া, পরটা, চা নিয়ে ছোটছুটি করছে।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার মাথা ব্যথা অনেকটা কমেছে। পুরি, হালুয়া, চা খেলাম। গাড়ি ছাড়লো। এক ঘণ্টার মধ্যে কালুখালি পৌছে গেলাম।

ভাটিয়াপাড়াগামী গাড়িতে উঠে বসতে না বসতে গাড়ি ছাড়লো। এটা লোকাল গাড়ি। প্রতিটা স্টেশনে থেমে থেমে বারোটায় বোয়ালমারী পৌছালো। সব যাত্রী নেমে যাচ্ছে।

কি হলো, গাড়ি তো যাবে ভাটিয়াপাড়া পর্যন্ত। এখনো তিন ঘণ্টার রাস্তা। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম গাড়ি আর যাবে না। বন্যার পানিতে রেললাইন ডুবে গেছে। কি করবো কিছুই বুঝতে পারছি না। সবার সঙ্গে আমিও বোচকা–বুচকি নিয়ে বোয়ালমারী স্টেশনে নামলাম।

কয়েকজন বললো, ভাটিয়াপাড়া যেতে হলে এখান থেকে নৌকা করে যেতে হবে এবং নয় থেকে দশ ঘণ্টা সময় লাগবে।

এ বিষয়ে আমার কোনো ধারণাই নেই। ঘাটে এলাম। এতো পথ কোনো নৌকার মাঝি যেতে চায় না। পরে একজন স্বীকার করলো। তবে তাকে তিন টাকা ভাড়া এবং রাতে খেতে দিতে হবে।

তাতেই রাজি হলাম।

নৌকায় ওঠার পর প্রচণ্ড ক্ষিধে অনুভব করছি। গতকাল সকাল নয়টায় খেয়ে বের হয়েছি। রাস্তায় তেমন কিছু খাওয়া হয়নি। মাঝিকে টাকা দিলাম কিছু চিড়ে এবং মিষ্টি কিনে আনতে।

মাঝি বাজারে গেছে।

একা নৌকায় বসে আছি। এমনি সময়ে এক বোরখা পরা মহিলা দুই তিন বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটে এলো। তিনি যাবেন আলফাডাঙার কাছে কোনো এক গ্রামে। নৌকার মাঝিদের সঙ্গে কথা বলেছেন। কিন্তু কোনো মাঝি যেতে রাজি হচ্ছে না। আলফাডাঙা এখান থেকে প্রায় পাচ ঘণ্টার পথ। তাছাড়া মহিলা যে ভাড়া দিতে চাচ্ছেন তাতেও মাঝিদের আপত্তি।

মাঝিদের মধ্যে একজন হঠাৎ বললো, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনি যেতে পারেন। তিনি ভাটিয়াপাড়া যাচ্ছেন। যাওয়ার পথে আপনাকে আলফাডাঙা নামিয়ে দেবেন।

ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তিনি কি আমাকে নেবেন?

ঘাটের সবাই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে আমি কি বলি শোনার জন্য।

এ সময় আমার নৌকার মাঝি ফিরে এলো। আমার হাতে চিড়ে, মিষ্টি দিয়ে নৌকা ছাড়ার উদ্যোগ করতেই বললাম, এ ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে আলফাডাঙা পর্যন্ত যেতে চান।

মাঝি বললো, আপনি যদি নিতে চান আমার কোনো আপত্তি নেই। বরং নৌকা ভারী হলে তুফানে দুলবে না।

ভদ্রমহিলাকে আসতে বললাম।

তিনি ছেলে নিয়ে নৌকায় উঠলেন।

মাঝি নৌকা ছেড়ে দিল।

নৌকা পঞ্চাশ গজ এগোতেই ভদ্রমহিলা বোরখা খুলে স্বাভাবিকভাবে বসলেন ছেলেকে কাছে নিয়ে।

ছেলে বিস্কিট বের করে খাওয়া শুরু করেছে।

নৌকার ছই-এর বাইরে রোদে বসে আছি। প্রচণ্ড রোদ, খুব কষ্ট হচ্ছে। ভেতরে আসবো কিন্তু লজ্জা লাগছে। মহিলা কি ভাববেন!

কিছুক্ষণ পরে মহিলাই বললেন, এতো লজ্জা পাচ্ছেন কেন। ভেতরে এসে বসেন। এতো বড় নৌকা, মাত্র দুইজন যাত্রী, অসুবিধা কোথায়?

ভেতরে এসে এক পাশে বসলাম।

ছেলেটা একটু বিস্কিট নিয়ে আমার মুখের কাছে এনে বললো, খাও।

মহিলা ছেলেকে ধমক দিয়ে বললো, এই, কি হচ্ছে, বল, কাকু, বিস্কিট খান।

ছেলেটা তাই করলো। বললো, কাকু, বিস্কিট খান। আমি নিতে চাচ্ছি না দেখে ভদ্রমহিলা বললেন, নিন, বাচ্চাদের দেয়া জিনিস খেতে হয়। বলে আরো কয়েকটা বিস্কিট বের করে আমাকে দিলেন।

বিস্কিট দেখে আমার প্রচণ্ড ক্ষিধে অনুভব হচ্ছে। বিস্কিটগুলো খেলাম। কিন্তু ক্ষিধে যাচ্ছে না। অনেকক্ষণ কিছুই পেটে পড়েনি। তবুও কিছুতেই এদের সামনে চিড়ে মিষ্টি বের করে খেতে পারছি না।

নৌকা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। কখনো ফাকা মাঠ, কখনো গাছপালার নিচ দিয়ে। কারো বাড়ির পাশ দিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। সূর্যের তাপ অত্যন্ত প্রখর। কিন্তু ঝির ঝির করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। এ জন্য তেমন গরম লাগছে না।

দেখতে দেখতে দুই ঘণ্টা পার হয়ে গেল। এক সময় দেখলাম মহিলা ঘুমিয়ে গেছেন। ছেলেও মায়ের বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে।

আমার ঘুম আসছে না। ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে পড়তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু মন বসছে না। ঘুমন্ত মহিলার মুখের দিকে তাকালাম। এতোক্ষণ ভালো করে তাকিয়ে দেখিনি। মনে হলো, তিনি আমার থেকে দুই তিন বছরের বড় হবেন।

আমার বয়স এখন একুশ বছর। মহিলার রূপের বর্ণনা দিতে পারবো না। তবে আমার চোখে এ মুহূর্তে তাকে অপূর্ব সুন্দর লাগছে। পাচ ফিট তিন ইঞ্চি লম্বা। গায়ের রঙ দুধে আলতা নয়, তবে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। এক মাথা ঝাকড়া চুল। এক হাতে সোনার এবং কাচের মিলিয়ে অনেক চুড়ি। অন্য হাতে একটা ঘড়ি। পরনে সবুজ রঙ-এর শাড়ি। নাকে একটা সুন্দর নাক ফুল। নাক ফুলটা তার সৌন্দর্যকে যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারছি না। আমার খুব লজ্জা লাগছে। হঠাৎ যদি জেগে যায়, কি ভাববেন!

সেই ষাট দশকের মেয়েকে আজকের মেয়েদের সঙ্গে তুলনা করা যাবে না। তবুও তাকে আমার যথেষ্ট *প্রগতিশীল* বলেই মনে হলো। চল্লিশ বছর আগে একাকী একটা মেয়ে অপরিচিত একটা যুবক ছেলের সঙ্গে

এতো দীর্ঘ পথ নৌকা করে যাচ্ছে। এতে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র সংকোচ দেখিনি, বরং আমিই সংকোচের মধ্যে ছিলাম তিনি কখন কি মনে করেন!

ছয়টার সময় তার ঘুম ভাঙলো। কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করতে করতে বলতে লাগলেন, ছিঃ ছিঃ, এতোক্ষণ ঘুমালাম! আসলে এই ঝিরি ঝিরি বাতাস, সঙ্গে নৌকার দোলানিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতে পারিনি। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি ঘুমোননি? এতোক্ষণ কি করলেন?

বইটা দেখিয়ে বললাম, পড়তে চেষ্টা করেছি।

এবার মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কতোদূর এলাম।

মাঝির উত্তর, স্যার, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আপনাদের গ্রামে পৌছে যাবো।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। গ্রামের পথে অন্ধকার নামছে। মাঝি হারিকেন জ্বালিয়ে আড়াল করে রাখলো।

মহিলা এবার আমাকে বললেন, আপনি কোথায় কি পড়েন? বাড়িতে কতো দিন থাকবেন? ঢাকা শহর কেমন লাগে? ঢাকা যেতে খুব ইচ্ছা করে। কিন্তু যেতে পারিনি। কে নিয়ে যাবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথা থেকে আসছেন?

জবাবে বললেন, বোয়ালমারীর ওই গ্রামে আমার শ্বশুরবাড়ি। যাচ্ছি বাপের বাড়ি।

আবার বললাম, ছেলের বাবা কি করেন?

অনেকক্ষণ পরে বললেন, কিছুই করে না। শুনতে পাই চাকরি খোজেন।

বুঝতে পারলাম তিনি এ বিষয়ে আর কথা বাড়াতে চাচ্ছেন না।

ব্যাগ খুলে দেড় টাকা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, ভাড়ার টাকাটা রাখুন।

আপত্তি জানিয়ে বললাম, টাকাটা নাই-বা নিলাম, আমি একাই যাচ্ছিলাম।

জবাবে বললেন, তা ঠিক। তবে আপনাকে না পেলে আমাকেও তো পুরো ভাড়া দিয়ে আসতে হতো। তাছাড়া আপনি ছাত্র মানুষ। আয় তো করেন না। নিন, বলে আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিলেন।

আমি পকেট থেকে টাকা বের করে এক টাকার নোটটা রেখে পঞ্চাশ পয়সা তাকে ফেরত দিলাম।

আমি আরো তিন ঘণ্টার পথ যাবো। সুতরাং ভাড়ার অর্ধেক আপনার দেবার কথা নয়। তিন ভাগের এক ভাগ আপনি দেবেন।

অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কি দেখলেন তিনিই জানেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং হঠাৎ করেই জিজ্ঞাসা করলেন, এতো অল্প বয়সে চশমা নিয়েছেন কেন? আমার থেকে বয়সে ছোটই তো হবেন। তবে চশমাতে আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে। অবশ্য আপনি এমনিতেও সুন্দর।

হাসলাম। বললাম, আপনার থেকেও?

কি যে বলেন, আমি আবার সুন্দর নাকি?

বললাম, ওই আপনার চোখে যেমন আমি সুন্দর তেমনি আমার চোখেও আপনি সুন্দর।

মনে হলো খুব লজ্জা পেয়েছেন।

এবার আমরা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আশপাশের বাড়িতে আলো জ্বলছে। গ্রামে ঢুকতেই প্রশ্ন আসতে শুরু করলো, কে যায়?

জবাব তো আমার দেবার কথা। কিন্তু কি জবাব দেবো? নাম বললে কেউ চিনবে না।

মহিলাই জবাব দিলেন, বড় চাচা নাকি? আমি সালমা।

ও সালমা! তা এই রাতের বেলা কোথা থেকে আসছিস?

বোয়ালমারী থেকে।

সঙ্গে কে, জামাই নাকি?

না চাচা, এ আমার দেবর।

সামনে এগোতে আবার প্রশ্ন, কে যায়?

এখান থেকে একই উত্তর। ছোট চাচা, আমি সালমা। বোয়ালমারী থেকে আসছি। না, সঙ্গে আপনাদের জামাই না। এ আমার দেবর।

এবার ছোট ফুপু। আমি সালমা। সঙ্গে দেবর।

এভাবে অন্তত দশ জায়গায় পরিচয় দিতে হলো। একই প্রশ্ন। একই উত্তর।

সবশেষে নিজের ঘাটে নৌকা পৌছালো। চারদিকে অন্ধকার। এতোক্ষণে আমি জেনে গেছি মহিলার নাম সালমা।

নৌকার মধ্যে থেকেই ডাক দিলেন, হাসিনা, হারিকেন নিয়ে আয়। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, চলি, আবার দেখা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমার নাম তো জেনেছেন। এবার আপনার নামটা জানতে পারি কি?

ছোট নামটা বললাম।

বেশ অবাক হয়েই বললেন, এতো ছোট নাম?

আমার জবাব, এ নাম শুধু আপনার জন্য।

ধন্যবাদ বলে মিষ্টি হেসে নৌকা থেকে নামার জন্য এগিয়ে গেলেন।

ততোক্ষণে হারিকেন, বাতি হাতে নিয়ে কয়েকটা মেয়ে ঘাটে পৌছে গেছে।

যে মেয়ের নাম হাসিনা সে এগিয়ে এসে বাচ্চাকে কোলে নিল। অন্যান্য মেয়েরা ব্যাগ, সুটকেস নামাতে শুরু করেছে। হাসনা নৌকার কাছে দাড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, কি ব্যাপার দুলাভাই, নামছেন না কেন? ফুল চন্দন দিয়ে বরণ করে নামাতে হবে নাকি?

সালমা ধমক দিলেন, এই, কাকে কি বলছিস। তিনি তোদের দুলাভাই নন।

সব কয়টা মেয়ে মুখ চাওয়াচায়ি করছে।

হাসনা বলে উঠলো, বুবু, দুলাভাই নয়, তবে কার সঙ্গে তুই একা রাতের বেলা এলি?

এ সময়ে মাও কুপি হাতে এসে পৌছেছেন। তার স্বরেও যথেষ্ট উদ্বেগ, বলছিস কি? জামাই নয়, তবে কে? কার সঙ্গে এলি?

সালমা বললো, মা, ব্যস্ত হয়ো না বলছি! তোমরা জানো ট্রেন বন্ধ। কোনো নৌকা আসতে চায় না। এ ভদ্রলোক যাবেন ভাটিয়াপাড়া। নৌকাটা তিনিই ভাড়া করেছেন। আমার দুরবস্থা দেখে তিনি দয়া করে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। না হলে আমি আসতে পারতাম না। কি যে অসুবিধা হতো!

মায়ের উৎকণ্ঠা তখনো যায়নি। বললেন, এ অবস্থায় জামাইকে তো নিয়ে আসতে পারতিস?

তোমার জামাইয়ের কথা আর বলো না। সে আজ সাত দিন নিখোজ। বলতে বলতে সালমা বোনদের সঙ্গে ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

মা তখনো দাড়িয়ে। এবার নৌকার কাছে এসে আমাকে উদ্দেশ্য করেই বললেন, এই যে ভালো মানুষের ছেলে, আজ আমাদের এখানে থেকে যাও।

আমি আপত্তি করায় আবার বললেন, অন্তত খাওয়া-দাওয়া করে যাও।

আবারও না করলাম। অনেক রাত হয়ে যাবে বাড়ি পৌছাতে। বাড়ির সবাই চিন্তা করবে।

এবার তিনি আমাকে বললেন, তা বাবা, তোমার বাড়ি কোথায়? ভাসাভাসা ভাবে বললাম, ভাটিয়াপাড়ার কাছে।

মাঝি নৌকা ছাড়লো!

গ্রাম পার হতে আটটা বেজে গেল।

বাইরে এসে দেখি প্রকৃতি নতুন সাজে সেজে আছে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না। আকাশে এক ফোটাও মেঘ নেই। একেই বোধহয় বলে শরতের জ্যোৎস্না। দিগন্ত বিস্তৃত ফাকা মাঠ। শুধু পানি আর পানি। দক্ষিণ দিক থেকে হু হু করে বাতাস আসছে। আমরা দক্ষিণ দিকেই যাচ্ছি। বাতাসের উল্টো দিকে যাচ্ছি। ছোট ঢেউ ভেঙে এগোতে হচ্ছে। ঢেউগুলো নৌকার তলায় আছড়ে পড়ছে এবং মিষ্টি–মধুর একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

তন্ময় হয়ে রাতের এ রূপ উপভোগ করছি। শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত* যেমন শ্মশানে বসে আধারের রূপ দেখছিল, আমিও তেমনি নৌকায় ভাসতে ভাসতে জ্যোৎস্না রাতের অপরূপ রূপ দেখছি। দূরে একটা দুটা বাড়ি অথৈ পানির মধ্যে শাপলার মতো ভাসছে। গান জানি না, তবুও গলা ছেড়ে গান করতে ইচ্ছা করছে।

এতো দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আমি পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত। কিন্তু প্রকৃতির এ রূপ দেখে ক্ষিধে–তৃষ্ণা সব ভুলে গেছি।

মাঝি বলছিল বাতাস আরেকটু বেশি হলে প্রচণ্ড তুফান হতো এবং নৌকা চালানো যেতো না।

তার কথা শুনতে পাচ্ছি না। কানে বাজছে শুধু *এ পথ যদি আর না শেষ হয় তবে কেমন হতো...*।

না পথ শেষ হলো। দশটার মধ্যে বাড়িতে পৌছে গেলাম।

এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা থেকে

অজানা অচেনা পদ্মা

– মোহাম্মদ সাব্বির

১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে বেশ ফুরফুরে মেজাজে ছিলাম। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল তখনো বের না হওয়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। তবে নদীপথে কোথাও যাওয়া হচ্ছিল না। হঠাৎই একদিন সুযোগ এলো নৌপথে ভ্রমণের।

আমার ফুপা কিছু দিন হলো চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে একজন কাজপাগল মানুষ হঠাৎ অবসর জীবনে প্রবেশ করায় নতুন জীবনের সঙ্গে খুব একটা মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। বাসায় মন টিকছিল না বলেই হয়তো কাউকে না বলে তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে যান।

ফুপা আমাকে ভীষণ আদর করতেন। তার এই নিরুদ্দেশ হওয়া আমাকে বেশ চিন্তিত ও ব্যথিত করলো। তাই ফুপাকে খুজতে বের হলাম। সম্ভাব্য যে জায়গায় তিনি যেতে পারেন সেই স্থানের উদ্দেশ্যে একদিন সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে সকালে রওনা হলাম।

আমাকে যেতে হবে শরিয়তপুর জেলার জাজিরা থানায়। সেখানে যদি ফুপার কোনো খোজ না পাই তাহলে শরিয়তপুর শহরেও আমাকে যেতে হবে। কারণ অবসর জীবনে যাবার আগে ফুপা এই জায়গাগুলোতে দীর্ঘ দিন কর্মরত ছিলেন।

ঢাকা সদরঘাট থেকে সকাল সাড়ে সাতটার লঞ্চে জাজিরার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এর আগে কখনো এতো দীর্ঘ সময়ের জন্য নৌপথে ভ্রমণে বের হইনি। আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে নদী একদম কানায় কানায় পূর্ণ। বুড়িগঙ্গার চেহারা দেখে মোটামুটি আশ্বস্ত হলাম যে, পদ্মার চেহারাও হয়তো এ রকমই হবে।

মুন্সিগঞ্জ জেলার কাঠপট্টি এলাকা দিয়ে খালের মতো একটি ছোট প্রশাখা পদ্মার দিকে চলে গিয়েছে। মুন্সিগঞ্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে সেই খাল দিয়ে পদ্মার দিকে অগ্রসর হলাম।

সকাল দশটা এগারোটার দিকে যখন সেই খালের মাধ্যমে বিশাল বিক্ষুব্ধ পদ্মায় প্রবেশ করলাম তখন দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আমার বুক কেপে উঠলো। ভীষণ স্রোত আর সেই সঙ্গে উত্তাল ঢেউয়ের মাঝে আমাদের ছোট লঞ্চের অবস্থা হলো কাগজের নৌকার মতো। উত্তাল ঢেউয়ের তালে লঞ্চ একবার উপরে উঠছে আর নিচে নামছে।

আমার সাতার জানা থাকলেও তা যে এখানে কোনো কাজে আসবে না সেটা ভালোই বুঝতে পারছিলাম। সে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে ছেয়েছিল মন। বিশাল এই পদ্মার সংহারী রূপ আগে কখনোই দেখিনি।

এই পদ্মার সর্বনাশা ভাঙনে কতো মানুষ হারিয়েছে তার সর্বস্ব। তবে এই পদ্মাতেই অনেক মানুষ তার জীবিকা সংগ্রহে নেমেছে জীবন বাজি নিয়ে। আমাদের লঞ্চের কাছাকাছি দেখছি অনেক ছোট নৌকায় জেলেরা ইলিশ মাছ ধরছে। আগে কখনো জীবন্ত ইলিশ দেখিনি। এখানেই প্রথম দেখলাম। ইলিশ খুব অল্প সময় জীবিত থাকে নদী থেকে তোলার পর। সত্যিকারের রূপালি ইলিশ বলতে যা বোঝায় তা নিজ চোখে দেখলাম।

এ সময় লঞ্চেও দুপুরের খাবারের জন্য ডাকাডাকি শুরু হলো। তাজা ইলিশ মাছ দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। লঞ্চের ডেকে বসেই বেশি ঝাল এবং ঝোল দিয়ে রান্না করা ইলিশ মহা আনন্দে খেলাম। এই ইলিশের স্বাদ আগে কোনোদিন পাইনি, ভবিষ্যতেও পাবো বলে মনে হয় না।

দুপুরের খাবার খেতে খেতে পদ্মা ভীতি আমার কিছু কমলো। জেলেদের দেখে মনে হলো তাদের মতো ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে পদ্মার বুক থেকে ইলিশ তুলে আনাটা ভীষণ চ্যালেঞ্জিং। গতানুগতিক ধরাবাধা নিরামিষ জীবনের চেয়ে এই জীবনের স্বাদ একদমই আলাদা। অনেকটা দুপুরের সেই বেশি ঝাল ও ঝোল দিয়ে রান্না করা তাজা ইলিশের তরকারির মতো।

দুপুরের খাবার খেয়ে পদ্মার সৌন্দর্য অনুভব করার চেষ্টা করলাম। মাঝে মধ্যেই শ্রাবণের মেঘে আকাশ ঢেকে যাচ্ছিল। মিহি শাদা সুতোর মতো মাঝে মধ্যে বৃষ্টি হচ্ছিল। লঞ্চ থেকে বৃষ্টির মধ্যে বাইরে তাকালে মনে হচ্ছে ঘষা কাচের মধ্য দিয়ে সব দেখছি।

সুমির কথা খুব মনে পড়ছে। এই নদীপথে তাকে সঙ্গে পেলে দারুণ মজা হতো। তাকে ভয় দেখিয়ে দারুণ মজা পেতাম। কারণ সুমি সাতার জানে না। সত্যিই তাকে ভীষণভাবে অনুভব করছি এ ভ্রমণে।

পদ্মার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে জাজিরায় পৌছালাম। নদীর ঘাট থেকে সোজা চলে গেলাম থানা কমপ্লেক্সে। সেখানে গিয়ে সৌভাগ্যবশত ফুপার এক সাবেক সহকর্মীর দেখা পেলাম। তিনি জানালেন যে, ফুপা এখন গোপালগঞ্জ জেলায় আছেন। খুব শিগগিরই তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। তিনিও বাসায় ফেরার জন্য অস্থির হয়ে আছেন।

টেলিফোনে ঢাকার বাসায় এই খবর জানালাম। সবাই টেনশন থেকে মুক্তি পেল। আমারও জাজিরা থেকে ফেরার অনুমতি মিললো।

বিকেলের ফিরতি লঞ্চেই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বিকেল ও সন্ধ্যায় পদ্মার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে রাতে ঢাকায় এসে পৌছালাম। বাসায় ফিরে যখন ক্লান্ত দেহে বিছানায় গেলাম তখন চোখ বুজে ঘুমের রাজ্য যেতে যেতেই যেন অনুভব করলাম পদ্মার সেই বৃষ্টি ভেজা বাতাসের ছোয়া আর অপরূপ সৌন্দর্য।

মহাখালি, ঢাকা থেকে

গায়ে কাটা

– দুলাল

আমি তখন এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্র। বড়বোনের বিয়ে উপলক্ষে আব্বা-আম্মাসহ আমরা তিন ভাই খুলনা থেকে স্পেশাল কোচে ঢাকা আসছিলাম। দুই মাস আগেই ছোট মামার সঙ্গে আমার দুই বোন গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেছে। মামারাই তার বিয়ে ঠিক করেছেন।

খুলনা থেকে ছেড়ে আসা বাসটি গোয়ালন্দ এসে যাত্রী নামিয়ে দিল এবং সুপারভাইজারকে ফলো করে সকল যাত্রী লঞ্চে গিয়ে উঠলো। ঘাট ছেড়ে লঞ্চ আরিচার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। পৌছাতে পয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগবে। এই সময়টুকু পার করা খুব বোরিং ব্যাপার যদি ভ্রমণটা নিঃসঙ্গ হয়। কারণ নিঃসঙ্গ ভ্রমণ কয়েকবারই

করেছি। তবে লঞ্চে চড়তে খুব ভয় লাগে। যদিও আমি স্কুলে চ্যাম্পিয়ন সাতারু ছিলাম। তবুও নদীর বিশালতা বলে কথা! শুনলেই গা শিউরে ওঠে। তাই ভ্রমণকালে এই পথটুকু আমি দোতলার ক্যাবিনে অথবা তার করিডোরে দাড়িয়ে টাইম পাস করি অর্থাৎ খোলামেলা জায়গায় অবস্থান করি। এর প্রধান কারণ হলো নদীর উন্মুক্ত পরিবেশ উপভোগ করা। খুব ভালো লাগে। পানির কল কল ধ্বনি, মোটা মোটা ঢেউয়ের সঙ্গে লঞ্চের সংঘর্ষে ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ, শন শন বাতাস, অথৈ নদীতে ভাসমান ছোট ছোট মাছ ধরা নৌকা, ছাতার মতো বেষ্টিত বিশাল আকাশ দেখে মনে হয় চারদিকে শুধু পানি আর পানি, স্থলের কোনো অস্তিত্ব নেই।

এরূপ পরিবেশে গান গাইতে ইচ্ছে হতো। গুন গুন করে গাওয়ার চেষ্টা করতাম, *ও নদীরে একটি কথা সুধাই তোমারে*। কিন্তু আমার কণ্ঠে বেমানান মনে হতো, সুর বিহীন, তাল বিহীন। তবে হৃদয়স্পর্শী এক ভালোলাগা গান। তখন অবশ্য পথিক নবীর বাবড়ি চুলগুলো নজরে পড়েনি। তা না হলে হয়তো মনে পড়তো, *নদীর জল ছিল না কূল ছিল না ছিল শুধু ঢেউ*।

যাই হোক। নিজের কণ্ঠ বেমানান মনে হলে কাব্য করতাম, সাহিত্যিকের মতো করে ভাবতাম, পাশে কাউকে কল্পনা করতাম। কল্পিত সময়টার মাঝে ডুবে যেতাম স্বপ্নের গহীনে। কারণ তখন বয়সটা ছিল সুদীপ্ত। সংবিৎ ফিরে পেতাম যখন ঢেউয়ের ধাক্কায় লঞ্চ কেপে উঠতো অথবা দূরের ছোট ছোট নৌকাগুলো ঢেউয়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতো। মনে হতো ওরা হারিয়ে গেছে, শরীর হিম হয়ে যেতো। যখন আবার নজরে পড়তো তখন আশ্বস্ত হতাম।

ওই দিন একা ছিলাম না, পরিবারের সদস্যরা সঙ্গে ছিল। আম্মা নিচ তলায় সাড়ে তিন বছর বয়সী ছোট ভাই টুটুলকে সঙ্গে নিয়ে বসে ছিলেন। আব্বা আর মিজান (বয়স আট বছর) এদিক-সেদিক হাটাহাটি করছিলেন। কিছুক্ষণ পর আম্মাকে রেখে দোতলার ক্যাবিনের ডান পাশের করিডোরের উচু গৃলে বাহু চেপে নদীর প্রকৃতি উপভোগ করছিলাম।

আমার ডান দিকে আব্বার কণ্ঠ শুনে এগিয়ে গেলাম। তিনি খালি পায়ে দাড়িয়ে আছেন। জুতা পলিশ করতে দিলেন। মিজানও পাশে দাড়িয়ে আছে। আমি এগিয়ে গিয়ে ক্যাবিন ছাউনির কর্নারের পিলার বরাবর দাড়িয়েছিলাম। আমার বুক পর্যন্ত কাঠের গৃল আটা। তারপরের অংশ থেকে লঞ্চের পেছনের ছাউনি পর্যন্ত নিচু গৃলের ওপর সহজে বসা যায়। মুচি সেখানে বসে জুতা পলিশ করছিল।

হঠাৎ লঞ্চের সামনের সরু অংশটি বাম সাইড বরাবর পচিশ ডিগ্রি কোণে পানির তলদেশে জাগ্রত চরের ওপর উঠে গেল। ফলে লঞ্চটি একদিকে কাত হয়ে গেল। আম্মাসহ আমরা যে সাইডে অবস্থানরত ওই সাইডই নিচের দিকে ডেবে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে একটা ভয়ংকর সম্মিলিত চিৎকার শুনতে পেলাম।

লঞ্চের উচু হয়ে যাওয়া অংশ আব্বার পেছনে ছিল বিধায় তিনি সামনের দিকে ঝুকে পড়লেন। ত্বরিত নিজেকে কন্ট্রোল করে মিজানকে নিয়ে কাঠের গৃলে পা ঠেকিয়ে বসে পড়লেন।

মুচি তার অবস্থান থেকে দৌড়ে অপজিটে গিয়ে দাড়ালো।

তার মতো অনেকেই অপজিটে ছুটে গেল।

কিন্তু আমি ছুটে যেতে পারিনি। কারণ বয়লারের চিমনিটা ছিল আমার প্রতিবন্ধকতা এবং তির্যক হওয়া লঞ্চের ওপরের বাকা পথে দৌড় দেয়া সম্ভবপর ছিল না।

তাৎক্ষণিকভাবে দিশেহারা হয়ে পিলার শক্ত করে ধরে দাড়িয়েছিলাম। কর্ণভেদী একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেলাম, আ-উ।

নিজের অজান্তে ডান হাত ডান দিকে বাড়িয়ে দিলাম। বোধ হয় ন্যাচারালি হয়ে গেল। চোদ্দ পনেরো বছর বয়সী একটি মেয়ে ছিটকে এসে আমার বাহুতে পড়লো। তখনি খামচি মেরে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। মনে হলো সমুদ্রের মাঝে ডুবন্ত অবস্থায় এক টুকরো শুকনো ভাসমান কাঠ খুজে পেল। হাতটা না বাড়ালে হয়তো ঝোক সামাল দিতে না পেরে পানিতেই পড়ে যেতো।

আমার পিঠের ওপর তার পুরো শরীরটা এটে জাপটে ধরেছিল। সবাই সে মুহূর্তের মধ্যে অচেতন হয়ে গেল। খোদার অশেষ মেহেরবাণী, চরে ওঠে যাওয়া লঞ্চের সামনের অংশটুকু পিছলে পানির দিকে নেমে গিয়ে আবার সোজা হয়ে গেল।

পুরো ঘটনাটি ঘটে গেল ত্রিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে। মেয়েটি তখনো আমাকে ধরে রেখেছে। শুধু সে একা নয়, থর থর করে কাপছে সবাই। তাকিয়ে দেখলাম আব্বা এ দৃশ্য দেখেছে কি না! এমন এক লোমহর্ষক মুহূর্তে কে কার দিকে তাকায়!

আমি তার হাত দুটো আমার শরীর থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শান্ত হতে বললাম। দেখলাম আব্বা ও মিজান ঠিক আছে। ছুটে গেলাম আম্মার কাছে। গিয়ে দেখি আম্মার বুকের সঙ্গে টুটুল মিশে আছে। চোখে মুখে আতংক। বড় বড় নিশ্বাস ফেলছে। সে ভয় পেয়ে খুব চিৎকার দিয়ে উঠেছে। হয়তো আর চার আঙুল নিচু হলে পানি ভেতরে ঢুকে পড়তো। আমি তো ভেবেছি পানি ঢুকেই গেছে।

তাহলেই শেষ। আম্মা বললেন।

(ঘটনাস্থলে) নদীর মাঝখানে চর হলেও পানি মানুষের উচ্চতার চেয়ে বেশি ছিল। চারদিকে পানি আর পানি। ডুবে গেলে কি যে হতো!

তাকিয়ে দেখি অদূরেই অস্পষ্ট আরিচা ঘাট দেখা যাচ্ছে। তখনো আব্বা নিচে আসেনি। দোতলায় গিয়ে দেখি বাক-বিতণ্ডা চলছে। আব্বা সারেংকে মারে মারে অবস্থা।

সারেং সকলের কাছে ক্ষমা চাইলো এবং খোদার কাছে শুকরিয়া আদায় করতে বললো।

সে আসলে প্রকৃত সারেং ছিল না। সে ছিল সহকারী এবং স্বীকার করেছে যে, তারই অসাবধানতায় সিগনাল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল।

আব্বাকে মানিয়ে নিয়ে এলাম। কিন্তু তার পায়ে জুতা নেই। মিজানের হাতে একটি জুতা। আরেকটি পানিতে পড়ে গেছে, মিজান বললো। তাহলে আর একটা রেখে লাভ কি? এটিও ফেলে দিলাম।

ফেললি কেন, আব্বা বললেন।

বললাম, একটা দিয়ে কি আপনি কুত কুত খেলবেন?

এমনি এক চরম মুহূর্তে আমাদের রহস্য আলাপে আম্মা হাসতে লাগলেন।

এবার ঘাটে নামার পালা। খালি পায়ে আব্বা কি করে যাবেন! দেখতেও খারাপ দেখায়। তাই তার প্যান্টের নিচের অংশ পায়ের গোড়ালি থেকে দুটো ভাজ দিয়ে উপরে তুলে দিলাম যেন অনুমানে বোঝা যায় যে, তিনি নামাজ পড়ে বেরিয়েছেন। এমনিভাবে বাসে এসে উঠলাম এবং গন্তব্যে ফিরে গেলাম।

ঘটনাটি আজো মনে হলে গায়ে কাটা দেয়, থর থর করে বুকটা কেপে ওঠে। বাচানোর মালিক আল্লাহ।

রায়পুর, লক্ষ্মীপুর থেকে

ট্রলারে

– শাহরিন সোনিয়া

আমার দাদাবাড়ি নেত্রকোনা জেলার অন্তর্গত এক প্রত্যন্ত গ্রামে। নেত্রকোনা পর্যন্ত বাসে যাওয়া গেলেও গ্রামে যেতে হলে নেত্রকোনা থেকে ট্রলারে করে যেতে হয়। সুরমা নদীর একটি শাখা নদী পার হয়ে গ্রামে যেতে হয়। সেই নদীও আবার এমন গভীর নয় যে, তাতে লঞ্চ চলাচল করতে পারে। ট্রলার ছাড়া এ পথে চলাচলের

আর কোনো বাহন নেই। ফলে দাদাবাড়ি গেলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে এই ট্রলারে করে যেতে হয়। কিন্তু এই ট্রলার জিনিসটা যে কি তা কেবল যারা এতে করে কখনো ভ্রমণ করেছেন তারাই জানেন।

এমনিতে এই যান আকারে লঞ্চ স্টিমারের তুলনায় অনেক ছোট। তার উপর আবার এর উচ্চতাও অতি কম। ফলে এর ভেতরে দাড়ানো তো কষ্টকর ব্যাপার, এমনকি যারা একটু বেশি লম্বা তাদেরকেও মাথা গুজে বসতে হয়। এরপর সবচেয়ে বিরক্তিকর দিকটি হলো এর শব্দ। ট্রলার চালানোর সময় থেকে এর ইঞ্জিনে থেকে যে শব্দের সৃষ্টি হয় তা ইঞ্জিন বন্ধ না করলে অর্থাৎ ট্রলার না থামালে বন্ধ হয় না। একে তো দাড়ানো যায় না, তার ওপর এই বিকট শব্দ। এমনি অবস্থায় আট ঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়ে আমাদেরকে গ্রামে যেতে হয়। ছেলেরা অবশ্য ট্রলারের সামনের খালি জায়গায় ইচ্ছা করলে একটু দাড়াতে পারে। তবে মেয়ে হওয়ায় আমার অথবা অন্য মেয়েদের এই সুযোগ হয় না। কারণ গ্রামের লোকেরা একে ভালো চোখে দেখে না।

এমন পথ পাড়ি দিয়ে একবার আমরা গ্রামে যাচ্ছিলাম। সেটা ১৯৯৪ সালের ঘটনা। তখন ক্লাস থ্‌-তে পড়ি। ছোট-ভাই আশিক তখন মাত্র দুই বছরের। তাকে নিয়ে এটাই আমাদের প্রথম গ্রামে যাওয়া। ট্রলারে আমি, আম্মা জানালা দিয়ে আশপাশের গ্রামের দৃশ্য দেখছি। ছোট ছেলেরা বড়শি দিয়ে মাছ ধরছে, মেয়েরা কলসী দিয়ে পানি নিচ্ছে। অনেকে আবার নদীর পাড়ে কাপড় ধুচ্ছে, তাতে সাবানের ফেনায় পানির খানিকটা অংশ ফেনিয়ে আছে। জেলেরা মাছ ধরার জন্য অনেক জায়গায় কারেন্ট জাল পেতে রেখেছে। সব কিছুই কেমন যেন গল্পের মতো লাগছিল।

আমি ও আম্মু এসব দেখছি আর গ্রামীণ বিষয়ে নানান গল্প করছি। যদিও ট্রলারের বিকট শব্দে চেচিয়ে কথা বলতে হয়। আব্বু সামনেই বসে পেপার পড়ছিলেন। আমার ভাইও আমাদের সামনেই বসে দুই একটা খেলনা নিয়ে খেলায় ব্যস্ত। হঠাৎ ভাইয়ের ওপর চোখ পড়তেই দেখি সে কান্নার ভঙ্গি করে মুখটা বিশাল হা করে আছে এবং চোখ দিয়ে পানি পড়ছে অর্থাৎ কাদছে।

কিন্তু ট্রলারের অতি শব্দে আমরা তার কান্না শুনতে পাইনি। জানি না সে কতোক্ষণ এভাবে কাদছিল। এই দৃশ্য দেখে প্রথমে একটু অবাক হলেও পরে বিষয়টা বুঝতে পেরে আমার তো আর হাসি থামে না। আম্মু তো তাকে সামলাতে ব্যস্ত। তারপর আবার আমার হাসি দেখে বিরক্ত হয়ে একটু পর পর আমাকে ধমকাচ্ছেন। কিন্তু অতি শব্দে সেই ধমকও শুনতে পাচ্ছিলাম না। শুধু মুখ ভঙ্গিটা দেখে বুঝতে পারছিলাম যে, তিনি আমাকে ধমকাচ্ছেন।

দীর্ঘ আট ঘণ্টার পথ পাড়ি দিয়ে যখন গ্রামে পৌছালাম তখন এ ঘটনা বাড়ির সবাইকে বলার পর আমার কাজিনদের হাসি তো থামে না। এ ঘটনা এখনো গ্রামে যাওয়ার পথে মনে হয়।

নয়াটোলা, মগবাজার, ঢাকা থেকে

অপরাধী

– সুমন

প্রায় বিশ বছর আগের কথা। অঝোর ধারার বৃষ্টিতে চারদিকে পানি থৈ থৈ করছে। নৌকা ছাড়া বাড়ি থেকে বের হওয়া ছিল একেবারেই অসম্ভব। তখনকার সময় রাস্তাঘাটের অবস্থা ছিল অতীব করুণ। আমাদের সংসারে মোট ছয়জনের বসবাস ছিল। এর মধ্যে তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। এখন আমরা তিনজন – আমি, বাবা, ছোট বোন আমেনা। তবুও একজন থেকে যায়, যার কথা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তুলে ধরা হয়নি। তিনি হলেন আমার মা। আমেনার জন্মের পর পরই মা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। আমাদের সবার পেটের আহার যোগাতে বাবা গৃহস্থালির কাজ করেন।

সেদিন আকাশে অনেক মেঘ ছিল। মাঝে মধ্যে দমকা হাওয়া বয়ে আসতো। বিকেলবেলা আব্বা বললেন, সুমন, আমেনাকে নিয়ে তুই থাক, আমি বিলে গাথা জালটা দেখে আসি। দেখি কোনো মাছ জালে আটকালো কি না।

কিন্তু বাবার কথা শেষ হতে না হতেই আমেনা বাহানা ধরলো সে বাবার সঙ্গে বিলে যাবে।

কি আর করা? আমেনার বাহানা পূরণ করতে আব্বা আমাদের দুজনকে নিয়ে বিলে গেলেন। আব্বা নৌকার বৈঠাটা আমার হাতে দিয়ে মাছ দেখছেন, পাশে আমেনাও। আষাঢ় মাসের বৃষ্টি যেন থামতেই চায় না।

আব্বাকে বললাম, আব্বা, তাড়াতাড়ি করেন, বৃষ্টি মনে হয় প্রবল বেগে আসবে। দমকা বাতাস আসারও সম্ভাবনা আছে।

জালে অনেক মাছ আটকা পড়াতে তাড়াতাড়ি করতে গিয়েও হচ্ছে না।

আব্বাকে আবার বললাম জাল বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য।

আব্বা বললেন, অনেক মাছ জালে আটকা পড়েছে। এগুলো নিয়ে আবার জাল পেতে যাই।

এক সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি নামা শুরু করলো।

বৃষ্টির সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে দমকা হাওয়া বইছে। পানির ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নৌকা দুলছে। হঠাৎ প্রচণ্ড বাতাসের আঘাতে আমাদের নৌকা ডুবে গেল।

আমি সামান্য সাতার জানলেও আমেনা জানতো না। তাই আমেনাকে নিয়ে আব্বা সাতার কাটছিলেন।

আমি তাদের পিছু পিছু সাতার কেটে যাচ্ছিলাম। পানির প্রচণ্ড ঢেউয়ে দুর্বল হয়ে পড়লাম। খুব চেষ্টা করেও আর সামনে এগোতে পারছিলাম না।

আব্বার তার এক হাতে আমেনা ও অন্য হাতে আমাকে নিয়ে এগোতে লাগলেন।

আমেনা, আমার চিৎকারে দূরের একটি নৌকা দ্রুত বেগে এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদের বাচানোর জন্য।

আব্বা ধীরে ধীরে পরিশ্রান্ত হয়ে পানি খেতে লাগলেন। এক সময় তিনি তলিয়ে গেলেন পানির নিচে।

আমি আর আমেনা হুশ হারিয়ে ফেললাম। এর মাঝে কি হয়েছে তা বলতে পারবো না। রাতের বেলা যখন জ্ঞান ফিরেছে তখন শুনলাম জাল ফেলে আব্বার লাশ তোলা হয়েছে। আমেনাকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে।

এভাবেই কেটে গেছে অনেক সময়। ছোট বোনের বিয়ে হয়েছে। রাস্তাঘাটের অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন আর রাস্তা তলিয়ে যায় না পানিতে।

একদিন খবর পেলাম বড় বোন মারা গেছেন। তাকে মাটি দিয়ে আসার সময় নৌকায় করে আসছিলাম। নৌকাটি ওই বিলের পাশ ঘেষে আসার সময় আমার মনে পড়ে যায় সেই ভয়াবহ অতীত দিনটার কথা। আব্বার কথা মনে করতেই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে।

এখনো নিজেকে অপরাধী মনে হয় এই ভেবে যে, আমাকে বাচাতে গিয়ে আব্বা তার প্রাণ হারিয়েছেন। তা না হলে তো তিনি আমেনাকে নিয়ে ভালোভাবেই এগোচ্ছিলেন।

সময়ের বিবর্তনে আজ অনেক পথ এগিয়ে গেছি। দুনিয়াতে সুন্দরভাবে বেচে থাকার জন্য একটা কাজও করছি। তবুও এরই মাঝে নিজেকে কেমন যে অপরাধী মনে হয়! মনে হয়, আমার বাবার মৃত্যুর জন্য একমাত্র অপরাধী আমি।

মুন্সীগঞ্জ থেকে

বসফরাসে

– কামরুল হাসান

ভোররাতে ইস্তাম্বুল স্টেশনে এসে ট্রেন থামলো। যাত্রা শুরু করেছিলাম দুই দিন আগে তেহেরান থেকে। তেহরান-ইস্তাম্বুল দুই দিন দুই রাতের জার্নি। সময়টা মার্চের শেষ। শীতের শেষে বসন্ত। চারদিকে সবুজের উকি ঝুকি। মৃদু-মন্দ শীতল হাওয়া।

লাগেজ গুছিয়ে যখন প্ল্যাটফর্মে নামলাম। ঘড়িতে ভোর সাড়ে পাচটা। ইস্তাম্বুলের মাটিতে পা রেখেই মনটা অনাবিল আনন্দে ভরে গেল। এই সেই ইস্তাম্বুল। ছেলেবেলায় পৃন্সিপাল ইব্রাহিম খা-র লেখায় পড়া *ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র*-এর ইস্তাম্বুল।

এক ধরনের আবেগে মন ছুয়ে গেল। ভালো লাগছিল আরো ভেবে, কিছুক্ষণের মধ্যে আমি এশিয়া থেকে ইওরোপে যাবো। ইস্তাম্বুল সেই লাস্যময়ী সুন্দরী নগরী যা দুই অংশ পড়েছে দুটো মহাদেশে – এশিয়া ও ইওরোপে। ইস্তাম্বুলের বুক চিরে বয়ে গেছে বিখ্যাত বসফরাস প্রণালী যা কৃষ্ণ সাগর এবং ভূমধ্যসাগর-কে যোগ করেছে। বসফরাসের পূর্ব পাড়ে ইস্তাম্বুলের এশিয়ান অংশ এবং পশ্চিম পাড়ে ইওরোপিয়ান অংশ।

আমি ইস্তাম্বুলের এশিয়ান অংশে দাড়িয়ে আছি নৌপথে বসফরাস পাড়ি দিয়ে ইস্তাম্বুলের ইওরোপিয়ান অংশে যাবার জন্য। এখনো ইস্তাম্বুল ভোরের পাতলা ফিনফিনে চাদর গায়ে ঘুমিয়ে আছে। ঘুম ভাঙেনি। বসফরাসের পাড়ে দাড়িয়ে দেখছিলাম আলোকিত ফেরিগুলো যাত্রী পারাপার করছে। বেঞ্চিতে বসে বসফরাসের ঠাণ্ডা জলহাওয়ায় একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল।

সি-গালদের ডাকে তন্দ্রা ছুটে গেল।

হ্যা, ভোর হয়ে আসছে। পূর্ব আকাশে লালিমা। কুয়াশা কেটে যাচ্ছে। চা, স্যান্ডউইচ খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিলাম।

ফেরি এসে গেছে। ফেরিতে উঠে ডেকের একেবারে ধারে রেলিং ধরে দাড়ালাম। সুন্দর এবং অপূর্ব একটি সকাল। সূর্য উঠে গেছে। তার আবির আছড়ে পড়ছে বসফরাসের ঢেউয়ের গায়ে গায়ে। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস।

মাথার উপরে সি-গালদের ডানা-ঝাপটানি ও ডাকাডাকি।

উৎসাহী যাত্রীদের অনেকেই রুটির টুকরো শূন্যে ছুড়ে দিচ্ছে।

সি-গালগুলো ড্রাইভ করে সেগুলো মুখে তুলে নিচ্ছে।

ফেরিতে বড় একটা লাল-শাদা, চাদ-তারা পতাকা উড়ছে। টার্কির জাতীয় পতাকা। আমাকে মনে করিয়ে দিল এখন আমি কামাল আতার্তুকের টার্কিতে দাড়িয়ে। বসফরাসের ঢেউয়ের দোলায় ফেরি এগিয়ে চলেছে। একটা টার্কি নাচের মিউজিক ভেসে ভেসে আসছে।

জীবনে অনেক নৌপথ ভ্রমণ করেছি। কিন্তু আজকের অনুভূতি সম্পূর্ণ আলাদা। যে বসফরাস প্রণালী পৃথিবীর দুটো মহাদেশকে আলাদা করে রেখেছে, আমি তার বুকে নৌবিহার করছি।

আস্তে আস্তে পূর্ব পাড়ের বাড়িঘর, দালান-কোঠা সব ঝাপসা হয়ে আসছে। পশ্চিম পাড়ের দালান-কোঠা চোখে পড়ছে। বেশ সাজানো-গোছানো এবং ইওরোপিয়ান আদতে তৈরি। একটি নগরীর দ্বৈত অবয়ব এবং জীবন ধারা বেশ চোখে পড়ে। এশিয়ান অংশে জীবনযাত্রায় রক্ষণশীলতার ছাপ। মেয়েরা কুর্তা ও মাথায় স্কার্ফ পড়েছে। ইওরোপিয়ান অংশে জীবনযাত্রায় জৌলুসের ছাপ মেয়েদের পোশাক-আশাক পশ্চিমা ধাচের।

বসফরাসে নৌ ভ্রমণ শেষ হয়ে এসেছে।

ফেরি ঘাটে লাগলো।

সুন্দরী এক টার্কিশ তরুণী এগিয়ে এলো।

বিনীত ভঙ্গিতে হেসে বললো, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম টু ইস্তাম্বুলস ইওরোপিয়ান পার্ট।

টরন্টো থেকে

quamrulhassan@hotmail.com

সন্দ্বীপে

– দেলোয়ার হোসেন সরকার

আমি উত্তরবঙ্গের উত্তর প্রান্ত পঞ্চগড়ের অধিবাসী। হিমালয়ের কোলে কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশে আমাদের বাস। কাজেই নৌকা দেখার সৌভাগ্য হলেও নৌকায় চড়ার সৌভাগ্য কদাচিৎ হয়। তবে নৌ পথ ভ্রমণ আমার জন্য একবার হয়েছিল যা বহুদিক দিয়েই আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। সে কথাই আজ বলতে চাই।

১৯৬৩ সাল। আমি তখন ঢাকা কায়েদে আজম কলেজ (বর্তমানে শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ)–এর ছাত্র। সে বছর জুন মাসে সন্দ্বীপ, হাতিয়া, চট্টগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলো প্রবল ঘূর্ণিঝড় এবং সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্ত হয়ে অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সন্দ্বীপ। এই সংবাদে আমরা কলেজ থেকে আর্তমানবতার সাহায্যে কিছু করার সিদ্ধান্ত নিলাম। বাজার, দোকান, পাড়া, বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেশ কিছু টাকা–কড়ি, কাপড়–চোপড় ও খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করলাম। কলেজের শিক্ষক–কর্মচারীবৃন্দও বেতনের একটি অংশ দান করলেন।

কলেজের অধ্যাপক মোশাররফ হোসেনের নেতৃত্বে ফোরকান মিয়া, মাহবুবুন্নবী, ফরিদউদ্দীন নিরোদ, এনামুল, নেওয়াজ, মাহফুজুল এবং আমি এই আটজনকে নিয়ে একটি *ত্রাণ কমিটি* গঠন করে খুব দ্রুততার সঙ্গেই সন্দ্বীপের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম রওনা হয়ে গেলাম।

চট্টগ্রাম স্টেশনে যখন পৌছালাম তখন সেখানে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। প্রথমে ভাবলাম এটা বোধহয় সমুদ্র উপকূলের আবহাওয়ারই বৈশিষ্ট। পরে জানলাম এটা সামুদ্রিক ঝড়ের রেশ। যাহোক, আমরা একটি হোটেলে আশ্রয় নিলাম।

সন্দ্বীপ যাওয়ার উপায় খোজার জন্য স্যার বের হলেন। ফিরে এসে বললেন, চট্টগ্রামের ডিসি নাকি এখন কাউকেই সন্দ্বীপ যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছেন না। কারণ ঝড়ের রেশ এখনো কাটেনি। সমুদ্র উত্তাল, এখন সমুদ্র পাড়ি দেয়া বিপজ্জনক। আমরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম যেভাবে হোক সন্দ্বীপ যাবোই।

অনেক চেষ্টা তদবিরের পর লাইফ বন্ড দেয়ার শর্তে ডিসি রাজি হলেন এবং *আল ফারুক* নামে একটি ছোট কার্গো জাহাজ যোগাড় করে দিলেন। সঙ্গে সন্দ্বীপের এডিসি–র জন্য একটি জিপ গাড়ি ও একজন ড্রাইভার দিলেন।

আমরা যখন রওনা দেবো দেখা গেল জিপের ড্রাইভার নেই। কোথাও তাকে খুজে পাওয়া গেল না। ডিসি খবর পেয়ে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করালেন এবং পরদিন সন্ধ্যায় রীতিমতো গ্রেফতার করে হাজির করালেন।

ড্রাইভারের সে কি কান্নাকাটি! আমাদের হাত পা ধরে তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুনয়–বিনয় করতে লাগলো।

অনেক বুঝিয়ে–সুঝিয়ে তাকে শান্ত করা গেল।

এরপর ১৪ জুন রাত নয়টায় আমার জীবনের এ পর্যন্ত একমাত্র স্মরণীয় নৌযাত্রাটি শুরু হলো। কিছুক্ষণ ভালোই চললো। কিন্তু যতোই সমুদ্রের গভীর যাওয়া শুরু করলাম ততোই বাতাসের বেগ ও ঢেউ–এর মাতম বাড়তে শুরু করলো। শেষে অবস্থা এমন হলো যে, দাড়িয়ে তো দূরের কথা, বসে থাকাও কঠিন হয়ে পড়লো। আমি তো শুয়েই পড়লাম এবং পাটাতনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত গড়াগড়ি খেতে শুরু করলাম।

এভাবেই প্রায় সারা রাত কেটে গেল। জাহাজ কোনদিকে যাচ্ছে, চলছে কি চলছে না কিছুই বলতে পারি না। শুধু কোনো রকমে নিজেকে জাহাজের মধ্যে ধরে রাখলাম। আস্তে আস্তে অন্ধকার কাটতে শুরু করলো। জাহাজের দুলুনিও কমতে লাগলো। ক্রমেই সকাল হলো। দূরে কিছু গাছপালা দেখা গেল। জাহাজ এক জায়গায় দাড়িয়ে গেল। আর নাকি এগোতে পারবে না। পোটলা–পুটলি ভাগাভাগি করে নিয়ে নিচে নেমে সাম্পানে উঠলাম।

সাম্পান কিছু দূর গিয়ে অল্প পানিতে আমাদের নামিয়ে দিল। পানি অল্পই। কিন্তু নিচে শুধু পলি। সামনে এক পা ফেলি, অমনি তা দেড় ফিট পলিতে ঢুকে যায়। এরপর পেছনের পা–টা টেনে তুলি। ওটা সামনে দিই আবার পেছনেরটা টেনে তুলি। মনে হচ্ছিল এর থেকে এভারেস্ট আরোহণ বোধহয় সহজই হতো।

যাহোক, এভাবেই সন্দ্বীপ শহরে পৌছালাম। শহরটাও তখন পলি দিয়ে ঢাকা। ঘরবাড়ি তো ভেঙেচুরে গেছেই।

একটা এতিমখানায় আমাদের আশ্রয় মিললো। নুরুল ইসলাম নামে একজনকে আমরা প্রায় সার্বক্ষণিক সঙ্গী পেয়ে গেলাম। তার সঙ্গ ও সহযোগিতা ভোলার নয়। তার ভাই আবার চট্টগ্রামের *সন্দ্বীপ সমিতি*–র সভাপতি। তাছাড়া আমরা পেয়েছিলাম বাংলার বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী কমরেড মোজাফফর আহমদের নাতিকে যে ওই এতিমখানায় থাকতো। তখন সে সম্ভবত সিক্স কিংবা সেভেনের ছাত্র ছিল।

সন্দ্বীপের এডিসি আবদুল হাইও জিপ ও ড্রাইভার পেয়ে আমাদের উপর বেশ খুশি ছিলেন। কাজেই আমাদের রিলিফ কাজে বেশ সুবিধাই হয়েছিল।

আমরা সন্দ্বীপে পৌছার দুই দিন পর প্রাদেশিক গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান সন্দ্বীপে যান। আমরা আগেই পৌছেছি দেখে তিনি তো আশ্চর্য। আমাদের সঙ্গে নিয়েই তিনি সব ঘুরে দেখলেন। ফেরার সময় হেলিকপ্টারে ওঠার আগে আমাকে দুটি একশ টাকার নোট দিলেন।

মোনায়েম খানের টাকা নিয়েছি শুনে অন্যরা তো আমাকে মারে আর কি!

দৌড় দিলাম টাকা ফেরত দিতে।

তখন হেলিকপ্টার চালু হয়ে গেছে।

আমি গিয়ে দরজা ধরে টাকাটা ফেরত দিচ্ছি।

কিন্তু তিনি নেবেন না।

আমি দেবো, তিনি নেবেন না।

এদিকে হেলিকপ্টার পুরোপুরি চালু হয়ে গেছে।

তার সঙ্গী পিএস–এপিএসরা বললেন, তোমরা যদি টাকাটা না নাও তাহলে ওটা রিলিফ হিসেবে দিয়ে দিও।

শেষে ওই টাকা দিয়ে প্রায় বিশ থান কাপড় কিনে এতিমখানায় দিলাম। তখন দৈনিক সংবাদে এ নিয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদনও বেরিয়েছিল।

ফেরার সময় অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে নিরাপদেই ফিরে এসেছিলাম।

রৌশনাবাগ, পঞ্চগড় থেকে

বাদাম দিমু

– তাহমিনা ইসলাম শম্পা

আমি গ্রামের মেয়ে হলেও ছোটবেলা থেকেই শহরে বাস করি। গ্রামে মাঝে মধ্যে গেলেও বর্ষাকালে যাওয়া হয় না। এইচএসসি পরীক্ষার আগে আমার বাবার কাছে বায়না ধরেছিলাম যে, এবার বর্ষায় গ্রামে যাবো।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরই চলে এলাম দাদিবাড়ি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার যন্ত্রাইল পূর্বপাড়া গ্রামে। চারদিকে শুধু পানি আর পানি।

একদিন ঠিক করলাম আমার বড় আপুর শ্বশুরবাড়ি যাবো। আমি আর আমার বড় ভাইয়া প্রথমে বাসে চড়ে বান্দুরা গেলাম এবং বান্দুরা লঞ্চঘাট থেকে নৌকা ভাড়া করে চললাম আপুর বাড়ি ধোয়াইর–এর উদ্দেশ্যে।

নৌকা হেলেদুলে চলছে। এক সময় মাঝি চাচা বললেন, একটু সামনে গিয়ে বাদাম দিমু।

মনে মনে খুব খুশি হলাম। ভাবলাম, ভালোই হলো। বাদাম যেহেতু কিনে আনা হয়নি, চাচা বাদাম দিলে মজা করে খাওয়া যাবে।

কিছু দূর যাওয়ার পর মাঝি চাচা নৌকায় পাল তুললেন।

খুশি মনে চাচাকে বললাম, বাদাম দিন, খাই। আপনি না বললেন, সামনে গিয়ে বাদাম দেবেন? দিচ্ছেন না কেন?

তখন আমার কথা শুনে বৃদ্ধ মাঝি ও তার ছেলে হেসে অস্থির।

আমার পাশে বসে বড় ভাইয়াও হাসছেন।

হাসতে হাসতে মাঝি চাচা বললেন, আম্মা, এই পাল তোলার নামই *বাদাম দেয়া*।

আমি এই ঘটনার আগে জানতাম না পাল তোলার নামই বাদাম দেয়া। তখন আমারও খুব হাসি পেয়েছিল। এখনো কোনো পাল তোলা নৌকা দেখলে সেই দিনের বৃদ্ধ মাঝির চাচার কথা মনে পড়ে যায় এবং হাসি পায়।

নবাবগঞ্জ, ঢাকা থেকে